জল্পনা

শ্রীহেমলতা দেবী

প্রকাশক
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য ১।০ মাত্র

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা করেন, কেমন করিয়া সেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে নানা চিন্তা তাঁহাদের মনে উদিত হয়। যাঁহারা স্বয়ং কোন মঙ্গলকর্ম্মে ব্যাপৃত নহেন, অকপট দেশহিতৈষী এরূপ লোকদেরও এই সকল চিন্তার মূল্য আছে। কিন্তু যদি আন্তরিক দেশহিতৈষণার সহিত কল্যাণকর্ম্মগত ও কল্যাণকর্ম্মলব্ধ অভিজ্ঞতা কাহারও থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তার মূল্য নিশ্চয়ই আরও অধিক।

এই পুস্তকখানির লেখিকা শ্রীহেমলতা দেবী বহু কল্যাণকর্ম্মে—বিশেষ করিয়া নারীজাতির হিতকর নানা কাজে—আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত চিন্তা যে নানা দিকে শ্রেয়ের পথপ্রদর্শক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাঠিকা ও পাঠকগণের পক্ষে একটি সুবিধার কথা এই, যে, লেখিকা ইহাতে এক একটি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অল্প কথাতে বলিয়াছেন, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া কিছু লেখেন নাই; এই জন্য যাঁহাদের অবসর কম, তাঁহারাও যে-কোন পৃষ্ঠায় বহিটি খুলিলেই দুই-চারি মিনিটের মধ্যে এমন কিছু পাইবেন যাহা মনে করিয়া রাখিবার ও ভাবিবার যোগ্য।

লেখিকা বলিয়াছেন, "জল্পনাগুলি প্রধানতঃ তাঁদের জন্য যে-সব ভগিনীরা আমাদেরি মত অর্দ্ধশিক্ষিতা অথবা অল্পশিক্ষিতা অথচ শিক্ষা কম ব'লে দেশ, সমাজ, পরিবার সম্বন্ধে দায়িত্ব যাঁদের অন্য কারো অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়।" কিন্তু আমার বিবেচনায় পুস্তকখানি, শুধু নারীদের নহে পুরুষদেরও, শুধু অল্পশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতদের নহে, সুশিক্ষিতদেরও পাঠযোগ্য।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঘাটশিলা
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২।

সূচী-পত্র

জল্পনা কাদের জন্য

জল্পনাগুলি প্রধানতঃ তাঁদের জন্য—যে সব ভগিনীরা আমাদেরি মত অর্দ্ধশিক্ষিতা অথবা অল্পশিক্ষিতা অথচ শিক্ষা কম বলে' দেশ, সমাজ, পরিবার সম্বন্ধে দায়িত্ব যাঁদের অন্য কারো অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। যাঁরা ভাবেন অথচ ভালো করে' ভাব্‌তে জানেন না—সন্তান পালন করেন অথচ গোড়া থেকে সুশিক্ষা দিয়ে সব দিকে সন্তানকে সামলে রাখ্‌তে জানেন না,—ঘরের মধ্যে পরিশ্রম করেন দিন-রাত অথচ অনভ্যাস বশতঃ বাইরে এসে কোন কাজে হাত লাগাতে পারেন না—সংসারে, পরিবারে যাঁরা চির-কল্যাণী অথচ সব রকম শিক্ষা ও সহজ স্বাধীনতার অভাবে অন্তরের কল্যাণ-আবেষ্টনে নিজের পরিবারটিকে ঘিরে রাখ্‌তে জানেন না—যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে বুদ্ধি খাটাতে শেখেন নি—সেই সকল প্রিয়তমা ভগিনীদের হাতে তুলে দিতে চাইছি জল্পনার কথাগুলি ভালোবেসে। বিপদ্‌কালে কোন কথা ফেলা যায় না শুনি; তাই একথাগুলিরও হয়তো কোন না কোন সুফল ফল্‌তে পারে কারো না কারো কাছে এই দুঃসময়ে।

সম্পাদকের চাক্ষুষ জ্ঞান

যাঁরা খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রিকা পরিচালনা করেন, নানা বিষয়ের খাঁটি খবর সংগ্রহ করা তাঁদের প্রধান কাজ। শোনা খবর অনেক সময় কানে আসে; তাই নিয়ে কারবার করতে বাধ্য হ'তে হয় চোখে দেখার সুযোগ ঘটেনা বলে' প্রায়ই। অন্য কাগজে লেখা খবর গুলিও মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করতে হয়, মন্তব্যও দিতে হয়। ভেবে চিন্তে, বুঝে বিবেচনা করে'। কিন্তু চাক্ষুষ জ্ঞানের কাছে এর কোনটিরই মূল্য বেশী নয়। সম্পাদকগণ চোখে দেখে' যে-সব খবর সংগ্রহ করে' সাধারণকে উপহার দেবেন, তার মত বিশ্বাসযোগ্য ও সন্তোষজনক সংবাদ আর কিছু হতেই পারে না। শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমানে দেশের নানাস্থানে ভ্রমন করে দেশটিকে নিখুঁতভাবে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ গ্রহণ করে'ছেন, এর ফলে আমরা দেশের অনেক খাঁটি খবর তাঁর কাছে পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছি। কয়েকমাসের মধ্যে তিনি বোম্বাই, পুণা, দিল্লী, এলাহাবাদ, নাগপুর, ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপট্টম, মজঃফরপুর, রাজসাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার প্রভৃতি ঘুরে' এসেছেন। এতগুলি যায়গায় মানুষদের সুবিধা-অসুবিধা শিক্ষার সুযোগ, আর্থিক উন্নতি-অবনতি, নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে চোখে দেখে' অনেক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তিনি সংগ্রহ করে' এনেচেন। এই সূত্রে দেশের অনেক নিখুঁত খবর সকলেই পাবেন তাঁর কাছে, আশা করা যায়।

আমরাও অধিকাংশ চোখে-দেখা-ব্যাপারের খবরই জল্পনায় দিয়েছি। যদিও আমাদের দেখাশোনার পরিধি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, সুযোগ কম, তবুও নিখুঁতভাবে যেটি জানি সেটিই বলতে চেষ্টা করি।

প্রেরণা

পাঠায়ে দিয়েছ দূত সাড়া জাগায়েছে
রাজপথে পদধ্বনি দ্রুততর তাই,
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা পথ দেখায়েছে
দূরান্তের প্রান্ত পানে দৃষ্টি মেলে চাই ॥
মৃত্যু আসি সচকিত পথের দুয়ারে
মরিতে জানে না কভু এ বিচিত্র প্রাণ,
ভগ্ন ছিন্ন ভূলুণ্ঠিত তবু বারে বারে
ফিরিয়া ডাকিছে, কোথা আছ ভগবান ?
সাড়া দাও, সাড়া দাও হে গুপ্ত অমৃত,
প্রত্যক্ষ চেতন-লোকে স্ফুটতর হও,
মিলনের মহাভূমি কর অনাবৃত
সবার অন্তর হতে একই কথা কও ॥
হে দূত, হে দিব্যশিখা, হে ধ্রুব আলোক
মর্ত্ত্য মাঝে মূর্ত্তি তব চিরাদৃত হোক্ !!

নূতন "সর্ত্ত"

আমরা মানুষ, আমরা মানুষ,
দেবতা কেহ নই,
মানুষ হওয়ার ভাগ্য পেলেই
তুষ্ট হ'য়ে রই।
পরের ভাগ্য কাড়তে যাওয়া
মানুষ হওয়া নয়,
সবার ভাগ্য বাড়্‌তে দিলে
মানুষ—মানুষ হয়।

সকল ভাগে আনন্দ, আর
সকল ভাগ্যে সুখ,
বিধির দত্ত সাধন গুণে
আন্‌বে সত্যযুগ।
নূতনতর এই প্রেরণা
নামছে ধরায় আজ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান 'সর্ত্তে'
বাঁটবে সবার কাজ!

জল্পনা

দেশের মানুষ

দেশের মানুষ তোমরা দেশের আনন্দ,—
পৃথিবীর সঙ্গে পাতাও
নূতনতর সম্বন্ধ।
শুনে' লও খবর সবে
পৃথিবী নূতন হবে,
বেছে' লও আপন আসন
যেথায় তোমার পছন্দ।

মানুষ এত নির্ব্বোধ জীব নয়, যে, জেনে' বুঝে' নিজের অনিষ্ট ঘটাবে। ইষ্টই সে চায়, সাধারণতঃ না-জানা না-বোঝা বশতঃই সে ইষ্টের বদলে অনিষ্ট ঘটিয়ে বসে। অজ্ঞ মা ছেলেকে মাছের মুড়া ও একবাটি পাঁঠার মাংস খাইয়ে ভাবে, তার উপর পুরু সর-জমানো ঘন দুধটুকু খাওয়ালে বুঝি ছেলের শরীরে আরো বেশী বলাধান হবে। ফলে অজীর্ণ রোগে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে যে ছেলে মারা পড়্‌বে সে কথা অজ্ঞ মা জানেন না। জানেন না বলে' হিতে বিপরীত ঘটান—অমৃত ভেবে নিজের হাতে ছেলের মুখে বিষ তুলে' দেন। গায়ের জোরে ছেলে যদি প্রতিবেশীর উপর অন্যায় অত্যাচার সুরু করে, অজ্ঞ বাপ গর্ব্বিত হয়ে ভাবেন, ছেলে বুঝি এমনি করে ক্রমে মহাবীর হ'য়ে উঠবে—পাড়ার সবাই তাকে ভয় করে' চল্‌বে। কিন্তু বেশীদিন যে সেটা খাটবে না,

দশের শক্তি একজোট হ'য়ে একদিন যে তার অত্যাচারের শোধ তুল্‌বে—ভীমের মত বলশালী ছেলেকে তারা ভুঁয়ে ফেলে ভূমিসাৎ কর্‌বে, সে কথা অজ্ঞ বাপ জানেন না। জানেন না বলে' দশের যোগে যে মানুষের আসল শক্তির বৃদ্ধি, সে কথা ছেলেকে শেখাতে পারেন না। ফলে দশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঁচার পরিবর্ত্তে ছেলে মরণের মুখে এগিয়ে চল্‌তে থাকে।

অজ্ঞ মায়ের আবেষ্টনের মধ্যে পরিবার কত ছোট হ'য়ে, কত সঙ্কীর্ণ স্তরে নেমে থাকে—তাঁদের অবুঝপনা ও অন্যায় জেদে পরিবারের কত সুখ-সুবিধা নষ্ট ও কত প্রকারে উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে—ছেলেমেয়েরা কতখানি অসহায় ও অরক্ষিত ভাবে মানুষ হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন। তাই মায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়িয়ে—মাকে কালের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে' তোলার জন্য দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকমাত্রেই এখন বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। কুমারী মেয়েকে তাঁরা যথাযথভাবে শিক্ষিতা করে' তুলে' তবে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে চাইছেন। বিবাহের পরেও যারা শিক্ষালাভে উৎসুক তেমন মেয়ের সংখ্যাও এখন নিতান্ত কম নয়। অসহায় বিধবাদের শিক্ষা ত দিতেই হবে, উপার্জ্জন করে' পেট চালাবার ও সসম্মানে পরিবারের মধ্যে বাস করার জন্য। তা ছাড়া মহৎ কাজে জীবন দিয়ে সংসার-সুখের অতিরিক্ত আর একটি অপার্থিব আনন্দময় সুখের আশা বিধবারা অন্তরে পোষণ করেন। সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে হ'লেও শিক্ষা থাকা চাই, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কি ভাবে কি করতে হবে জানার জন্য।

শিক্ষা অতীতকে দেখায়, ভাবীকে ভাবায়, বর্ত্তমানকে কাজে লাগাতে শেখায়,—অসৎকে সে সৎ করে, ও সৎকে মহৎ করে' তোলে নিজের গুণে। দেশের ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার আদর যে আজ বেড়ে গেছে, সে

কেবল সৎ মেয়েদের সুশিক্ষার সুফল দেখে'। যাঁরা সৎ, উচ্চ শিক্ষা পেলে যে তাঁরা কত বেশী সৎগুণের আধার হয়ে উঠেন, তেমন মা-বোন স্ত্রী-কন্যা যাঁদের ঘরে আছেন তাঁরাই তা বোঝেন। প্রত্যেক পরিবারে তাঁরা মস্ত সহায়।

অজ্ঞ বাপের অধিকারে পরিবার কি ভাবে পীড়িত হয় অনেকেই তা জানেন ও দেখেছেন। বাড়ীর মেয়েদি'কে অপরিমিত শাসনে রাখা ও ছেলেদি'কে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া—অজ্ঞ বাপের একটি বিশেষ লক্ষণ। গায়ের জোরকেই তিনি বড় বলে' জানেন,—ধর্ম্মবুদ্ধির ধার বড় একটা ধারেন না। স্ত্রীকে নিজের চেয়ে দুর্ব্বল জেনে অনায়াসে তাঁর প্রতি অত্যাচার ও প্রতি কথায় কটূক্তি করে' নিজেকে খুব উপযুক্ত কর্ত্তা হিসাবে শ্লাঘা বোধ করেন। সৎবুদ্ধির সহায়তায় সকলের সহযোগিতার ফলে যে অপরিমেয় বলসঞ্চয় ঘটে, সে খবর তিনি রাখেন না। তাই সর্ব্বপ্রকারে নিজেও বিড়ম্বিত হন, পরিবারকেও বিড়ম্বিত করেন।

দেশের ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা এখনো কিছু কম নাই। এখনো লক্ষ পরিবার এই সকল অত্যাচার ও অজ্ঞতার চাপে প্রতিদিন নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হ'চ্ছে। শিক্ষার দ্বারা সকলের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও মন মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ না হলে এর হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নাই—

ছোট মন বড় হোক্,
বুদ্ধি হোক্ সোজা,—
দশে মিলে, করি কাজ
নেমে যাক্ বোঝা।

অজ্ঞতার যে বিপুল বোঝা এখনো দেশের বুকে স্তূপাকার হ'য়ে চেপে আছে, তাকে নামাতে হ'লে দশে মিলে একজোট হ'য়ে কাজ সুরু

করতে হবে চারিদিক থেকে—দেশের সকল লোকের শেখবার ও শেখাবার সুযোগ ঘটাতে হবে বিধিমতে—সকলকে খাটতে হবে অবিশ্রাম। তবেই সারা পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞান দেশের বুকে এসে জম্‌বে। দেশের জ্ঞানে পৃথিবীর জ্ঞান মিশিয়ে দেশের মানুষ নূতন হ'য়ে গড়ে' উঠে পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে এগিয়ে পড়্‌বে সহজে।

পৃথিবীকে নূতন করে' গড়ে' তোলার ভার মানুষের। মানুষ অজ্ঞ থাক্‌লে পৃথিবীর কাজ চলে না। না-জানার পথ পেরিয়ে জানার পথে প্রত্যেক মানুষকে পা বাড়িয়ে চল্‌তে হবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে পৃথিবীর কাজ কর্‌তে হবে সারাক্ষণ। এই ঐশ্বরিক প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে' বাঁচতে পারবে কে?

দেশের বুকে এই প্রেরণা আজ নেমেছে—দেশের জল-মাটিতে তার প্রভাব বিস্তার হয়েছে—দেশের মানুষ বল্‌তে সুরু করেছে—আমরাও পৃথিবীর কাজ কর্‌ব—পৃথিবীকে যা' পারি তা' দিয়ে যাব—কাজ করে' পৃথিবীর গায়ে নিজেদের চিহ্ন রেখে যাব নিখুঁত ভাবে।

এ ডাকে সাড়া না দিবে কে?—

দেশের জাগরণ

দেশের কাজ নিয়ে আজকাল টানাটানি পড়ে' গেছে চারিদিকে—সকলের মধ্যে। সকলেই দেশের কাজ কর্‌তে চান; হুড়াহুড়িতে একটা কাজের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছেন দশ জনে। তাতে নিজের শক্তিও ভাল করে' খাটানো যায় না, অন্যের কাজেও বিঘ্ন ঘটে। সময় এসেছে—যখন নিজেদের মধ্যে কাজ বিভাগ করে' নিতে হবে। অন্তরের সঙ্গে যিনি যে কাজটি কর্‌তে পারেন তিনি সেইটিই করুন। সকলের কাজের ওপর সকলে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা রাখুন। সেজন্য যতটুকু সংযমের দরকার

ততটুকু সংযত সবাই হোন্। তবেই কাজ সুন্দর হ'য়ে উঠে' দেশকে আনন্দিত করবে।

দেশকে একটি বৃহৎ মানুষ বলে' কল্পনা করা যাক্। আমরা সকলে যেন তার ছোট ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দেশের কাজে দোষ দেওয়া যায় না কাউকেও। দেশ সকলের—দেশের কাজে অধিকার সকলের সমান। কথামালার গল্পে উদর ও অন্যান্য অবয়বের দৃষ্টান্ত মনে রেখে "আমি সব হব" বা "সব কর্‌ব" এই রকম অ-বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, "যে যা হ'তে পারি তাই হব"—এই সুবুদ্ধির শরণাগত হওয়া দরকার।

দেশ জেগেছে—সে আর ঘুমোবে না। তার অন্তরে একটি ঐশ্বরিক প্রেরণা এসেছে, যাতে সে আজ প্রবুদ্ধ। সকল মানুষ নিজের অন্তরে সেই প্রেরণা অনুভব কর্‌ছেন—আনন্দের সংবাদ

"আনন্দ জেগেছে প্রাণে—
দেশে তারি জয়গান ;
মানুষ—মানুষ হবে,
মুক্ত হবে বদ্ধ-প্রাণ।"

নারীর মুক্তি,—ব্রাহ্মণেতর জাতির মুক্তি এর ফলে সুনিশ্চিত।

জাতি সমন্বয়

জাতি সমন্বয়ের চেষ্টা এদেশে আকস্মিক কোন নূতন ব্যাপার নয়! কয়েকবার কয়েকজন মহাপুরুষের সাধনাকে আশ্রয় করে' মানুষজাতিকে এক করার চেষ্টা দেখা গিয়েছে এদেশের হিন্দুজাতির মধ্যেও। জাতির ইতিহাসে এর একটা ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজাতি গঠনের বৃহৎ আয়োজনের পরেও, বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও পঞ্জাবে গুরু নানকের শিখ সম্প্রদায়

একজাতিত্বের নিশান উড়িয়েছে এদেশের বুকে বারম্বার। ছোট জাতের মানুষরা বৈষ্ণবী ভেক নিয়ে' শুদ্ধ হয়ে' সমাজের মধ্যে 'জলচল' হয়ে থাকে কে না জানে! সাধুভক্ত বৈষ্ণব—যে বর্ণ হ'তেই উদ্ভূত হোন-না-কেন—তিনি যে মানবশ্রেষ্ঠ, একথা বৈষ্ণবগণ মুক্ত কণ্ঠে বলে' থাকেন। বৈষ্ণব সমাজে ব্রাহ্মণের আদর আদৌ বেশী নয় তাঁদের চেয়ে। এ ছাড়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ছোট ছোট দলেরও অভাব নাই, যারা নিজেদের দলের মধ্যে জাতিসমন্বয় ঘটিয়েছে কতবার কত রকমে।

অন্যদিকে সন্ন্যাস গ্রহণে জাতি-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে রয়েছে হিন্দুসমাজের মানুষগুলির মধ্যে কোন্ অতীত কাল থেকে। এ দেশের যোগীদের ভেদবুদ্ধি চলে যায় যোগের সিদ্ধিতে, পরমহংসদল চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করেন নির্ব্বিকার চিত্তে। এঁরা সকলেই উঁচু দরের মানুষ। এঁরা যেটি করেন সেটি কখনও পাপ বা নিকৃষ্ট কাজ হ'তে পারে কি! এখন দেখা যাচ্চে, অস্পৃশ্যজাতির অন্নগ্রহণও একটি অত্যাশ্চর্য্য নূতন ব্যাপার নয় এজাতির মানুষদের কাছে—এরও 'চল' আছে এঁদের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে।

ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মান শূদ্র হয়ে; উপনয়ন সংস্কারে হন দ্বিজ। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করা—নীচুকে উঁচুতে তোলা—এরও তো বিধান রয়েচে দেখা যাচ্চে এ সমাজের মধ্যে। তবে আজ অস্পৃশ্যজাতিকে তুলে নিতে বাধা কি ভয়ই বা কিসের? ছোটকে বড় করাই তো ধর্ম্মের গুণ ও শক্তি। যে যা ছিল, তাই যদি সে রয়ে গেল, তবে আর ধর্ম্মসাধন করে' হোল কি!

হিন্দু পরজন্মে বিশ্বাসী; এজন্মের অস্পৃশ্য মানুষ যদি পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে পারে এমন হয়, তবে শিক্ষা ও সাধনার গুণে ও শুচিতা অভ্যাসের ফলে ইহজন্মেই তার সে পরিবর্ত্তন ঘটা এমনই কি অসম্ভব!

হৃদয়বান্ হিন্দুজাতি আজ ভাল করে' কথাগুলি ভেবে দেখুন, এই

নিবেদন। মেয়েরাও বাদ না পড়েন এ বিষয়ের ভাবনা থেকে—সেইজন্যই এখানে একথার অবতারণা।

দেশভক্ত

দেশের সহস্র নরনারী আজ দেশের কাজ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। দেশের পক্ষে এটি যে মহা সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য-দীপ্তির অন্তরালে যে দুর্ভাগ্যের একটি কলঙ্কলিপ্ত মলিন রেখা টানা হয়েছে, সেটি সকলে মিলে দু'হাত দিয়ে মুছে না ফেল্‌লে এই দীপ্তি দেশের মাটি থেকে ঊর্দ্ধে উঠে' আকাশপথে আলোক বিকীর্ণ করে' পৃথিবীর সামনে দেশকে তুলে' ধরতে পার্‌বে না। বিরোধ-বিচ্ছেদের দ্বারা দেশের প্রাণকে, শক্তিকে, আত্মাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ? যাঁরা শক্তিশালী তাঁরাই যদি বিরোধে ব্যাপৃত থাকেন তবে দেশ বাঁচায় কে? কবিতায় আছে—

"মজ্জাগত দুর্ব্বলতা আছে আমাদের
মিলিতে পারি না মোরা, লক্ষ প্রমাদের
করিতে পারি না শেষ। তাই নিত্য ভয়
জীবনে জড়ায়ে থাকে,—দুর্ভাগ্য সঞ্চয়
করি তাই প্রতি পদে,—শত লক্ষ প্রাণ
জীবিত থাকিতে মোরা তাই ম্রিয়মান।"

দেশের ইতিহাসে নিজের নামটি অমর করে' রেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে দেশের নামটি অমর করে' রেখে যাওয়ার ইচ্ছা কি প্রকৃত দেশভক্তের প্রাণের কথা নয়?

"চোখের পরে জেগে থাকুক দেশ,—
ঘুচুক দ্বন্দ্ব, ঘুচুক ধন্দ,
ঘুচুক বন্ধ-ক্লেশ।"

* * *

মহানারী

প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক বল্‌লেন, নারী যদি শ্রেষ্ঠ মানবত্ব লাভ করেন, তবে নারী, নারী না থেকে পুরুষ হ'য়ে যান। কথাটা কানে কেমন ঠেক্‌ল—নারী আবার কেমন করে' পুরুষ হ'য়ে যাবেন? লোকে কথাটা শুনে হাস্‌বে যে! উত্তরে তিনি বল্‌লেন—যিনি আত্মার আলোকে চলেন, বলেন, কাজ করেন, তিনি নর ও নারী এই উভয় সংজ্ঞার ঊর্দ্ধে উঠে' যান।—তখন তাঁকে পুরুষ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?—যেমন মহাপুরুষ।

বেশ ত। শ্রেষ্ঠ মানবীকে না হয় মহানারী বল্‌লেই হবে—শোনা মাত্র লোকে তা'হলে বুঝতে পার্‌বে, কাকে বল্‌ছে ও কি বল্‌ছে।

উত্তর—তা মন্দ হয় না বটে, এখন থেকে ঐ সকল নারীরা তাহ'লে মহানারী নামেই অভিহিতা হোন!

* * *

পুরী আশ্রমে ছাত্রীদের সুযোগ

বিধবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, মাসিক হাতখরচের দু'একটি টাকার জন্য তাঁরা প্রায়ই বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। বাড়ীতে চেয়ে চেয়ে হয়রান হন—টাকা সহজে আসে না! এই অসুবিধা

দূর করার জন্য পুরী বিধবাশ্রমে একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পুরীর মহানুভব ব্যক্তিরা এ বিষয়ে সহায়তা কর্‌ছেন। কাটিংয়ে যাঁরা অল্প পরিমাণেও শিক্ষিতা হ'য়ে উঠ্‌ছেন, অবসর-সময়ে তাঁদের দ্বারা অর্ডারী কাজ করিয়ে দু'এক টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাও চল্‌ছে,—কিছু কিছু উপার্জ্জনও হ'চ্ছে।

অন্যান্য বিধবা-প্রতিষ্ঠানেও এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে ছাত্রীদের পক্ষে ভাল হয়।

*　　*　　*

বঙ্গীয় সদ্গোপ-সভার মহিলা-বিভাগ

কয়েক দিন হ'ল উক্ত মহিলা-বিভাগের একটি রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়েছে। রিপোর্টটি পাঠ করে' আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি।

বছর-দুই আগে বঙ্গীয়-সদ্গোপ সভার পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে জানান যে, তাঁরা ঐ সভা থেকে একটি মহিলা-বিভাগ স্থাপন কর্‌তে ইচ্ছুক। আমরা যেন উপস্থিত থেকে তার প্রথম আয়োজনটা সুরু করিয়ে দিই। তাঁদের অনুরোধে সেখানে যাই ও সম্ভ্রান্ত সদ্গোপ মহিলাদের ভদ্রতা, সভ্যতা, আদব-কায়দা, পরিচ্ছদপারিপাট্য ও স্বাস্থ্যশ্রী দেখে মুগ্ধ হই। নিজের দেশে সদ্গোপ-সমাজে এমন শোভনস্বভাবা এতগুলি মহিলা আছেন ইহা আমার ধারণা ছিল না। নিজের এই অজ্ঞতার জন্য লজ্জাবোধ কর্‌লুম। সে দিনের সভায় তাঁরা তাঁদের স্বজাতীয় মহিলাদের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হন। দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান রিপোর্টে সেই চেষ্টার সুফল দেখে তাঁদের

প্রীতি ও সম্মান জানাচ্ছি। সদ্গোপ জাতীয় বিধবাদের উন্নতি ও উপার্জ্জনের জন্য তাঁরা বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হোন, এই অনুরোধ।

এইখানে একটি কথা মনে আসে। নিজের বিশেষ একটি কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্বমানবের সেবা কর্‌তে পারেন, এমন শক্তিশালী পুরুষ বা নারী সংসারে দুর্ল্ভ। তাঁরা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রণম্য। বিশ্ববাসীর মা হবার অধিকার ক'জন নারীর থাকে? কিন্তু নিজের সন্তানের মা হবার অধিকার প্রত্যেক নারীরই আছে। বিশ্বের কর্ম্মভার গ্রহণ কর্‌তে না পেরেও, স্বপরিবার, স্বজাতি, স্বসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবেন, ইহাই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস!

* * *

নারীর হত্যাপ্রবৃত্তি

মানুষ যখন মানুষের বুকে ছুরি বসায়—বুক লক্ষ্য করে' গুলি ছোঁড়ে, তখন সে কতকটা উন্মত্ত হয়েই কাজটি করে থাকে। নিজের ও অন্যের মধ্যে এরূপ উন্মত্ততার প্রশ্রয় দেওয়া যে কতদূর অনিষ্টকর ও কত গুরু অপরাধের আকর, বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই তা বোঝেন—জ্ঞানীরা খুব ভাল করেই তা জানেন! দুঃখ যখন একান্ত দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে, দুর্দ্দিন যখন দশদিকে ঘনিয়ে আসে বুদ্ধি স্থির রাখাই তখন বাঁচবার একমাত্র উপায়। বুদ্ধিনাশে সকল দিকে সর্ব্বনাশ ঘটে একথা কি সত্য নয়? জাতির শুশ্রূষাকারিণী মায়ের জাতও যদি হত্যাকারিণী পাষাণী হ'য়ে ওঠেন, তবে জাত বাঁচ্‌বে কার কোলে গিয়ে? ভগবানের নাম উচ্চারণ করে' যে কাজ কর্‌তে পারা না যায় সে কাজে সুফল প্রত্যাশা দুরাশা।

হত্যাকারী হত্যার সময় ভগবানের নাম উচ্চারণ করে' মানুষের বুকে ছুরি বসাতে পারে কি? সহস্র বৎসর ব্যাপী অনৈক্যের দারুণ দুর্ব্বলতায় জাতি জর্জ্জরিত; একটি মানুষ মেরে সে অপরাধের ক্ষালন হবে এও কি সম্ভব? কল্যাণবুদ্ধিতে জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সমগ্র জাতির কল্যাণকে একদৃষ্টিতে সকলের দেখ্‌তে শেখা, ভগবানের শরণাগত হ'য়ে ঐশীশক্তির প্রসাদ ভিক্ষা করা চাই প্রত্যেকের, তবেই ভগবান নিজহাতে পরিত্রাণ বেটে দেবেন জাতির ঘরে ঘরে।

দেশের আব্‌হাওয়া

আজকাল অনেক বাপ-মাকে বল্‌তে শোনা যায়, ঘরের ছেলে-মেয়েদের বাগ মানানো যায় না আদৌ; দেশের উত্তেজক আব্‌হাওয়ার মুখে তারা। উড়ে চল্‌ছে দিন-রাত,—ঘূর্ণিপাকে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। কোন একটি সুব্যবস্থার মধ্যে এনে তাদের স্থিতি করানো মহাদায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেশের মধ্যে। সন্তান নিয়ে সকলেই যেন আজ বিপন্ন!

দেশের হাওয়া যেদিকে বয় মানুষ সেদিকে চল্‌বেই। সে চলার গতি রোধ করবে কে? সন্তানের বাপ-মারা উদাসীন না থেকে যদি সেই হাওয়ার মুখে নিজেরাও এসে দাঁড়ান ও তার অনুকূল-প্রতিকূল গতিবিধিগুলি নিজের চোখে স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করেন, তবে ঘরে এসে তাঁরা সন্তানকে সুবুদ্ধি সৎপরামর্শ দিয়ে যথাযথ ভাবে দেশের কাজে লাগাতে পারেন। মনুষ্যত্বের নূতনতর চেতনায় সমস্ত পৃথিবী আজ সচেতন হ'য়ে উঠেছে সব দিকে,—চাপ দিয়ে সে চেতনাকে কারো মধ্যে চেপে রাখা চল্‌বে না আর ছেলে-বুড়ো নির্ব্বিশেষে। বাপ-মা'রা তাই অনর্থক ছেলে-মেয়েদের চাপতে না গিয়ে দেশের ও দশের কাজ তুলে দিন তাদের হাতে যত পারেন। নিজেরাও

সেই সঙ্গে নেমে পড়ুন দেশের সকল কাজে। ঘরের বাইরে সংস্কার সুরু করে' দিন দেশ-সমাজ-পরিবারে। তবেই ছেলে-মেয়েদের ঘরে পাবেন বাইরে পাবেন,—দেশের কাজে দেখ্‌তে পাবেন নূতন ভাবে নূতন করে'। স্বাস্থ্যে গড়ে' তুলুন তাদের দেহ, শিক্ষায় গড়ে' তুলুন তাদের মন, শিল্পে ব্যবসায়ে সহায় হ'য়ে বাঁচিয়ে রাখুন তাদের দেশের ধন। বাপ-মা সঙ্গে থেকে কাজ করালে সামঞ্জস্য ছাড়িয়ে তারা যখন-তখন ছিটকে পড়্‌বে না অপথে বিপথে। সুখী হবে সকল পরিবার সন্তানদের নিয়ে। দেশ ছেড়ে সুদশার আশা নিরাশা!

অভিভাবকের দায়

পরিণত মন-বুদ্ধিতে ভালোমন্দ বিচার করে' যাঁরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কাজ সম্বন্ধে কারো বলার কিছু থাকে না। তাঁরা নিজের জ্ঞানে চলেন—মানুষ ও ভগবান উভয়ের কাছে নিজের কাজের নিজেই জবাবদিহি কর্‌তে পারেন স্পষ্ট করে; অন্ততঃ সেরূপ আশা করা যায়। কিন্তু মন যখন কাঁচা, বুদ্ধি অস্থির, অভিজ্ঞতা অল্প, বয়সও খুব কম,—উত্তেজনার বশে নিজের স্বভাবের বিপরীত যে কোন কাজ করে' ফেলা যখন সকল মানুষের পক্ষে সহজে সম্ভব, সেই বয়সের ছেলেমেয়েরা অভিভাবকের চোখ এড়িয়ে পারিবারিক প্রভাব থেকে ছিট্‌কে পড়ে' বাইরের নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়্‌লে জাতির গঠন-কাজে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘট্‌বে বলে' আমরা মনে করি। এ সম্বন্ধে আমরা অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চাই।

অভিভাবকের দায় বড় গুরু। শিশুকালে বাপ-মা সন্তানকে সকল আপদ থেকে সরিয়ে রাখেন—বাল্যকালে দুর্নীতি থেকে দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা করেন। চরিত্রটি তাদের কতক পরিমাণে গড়ে' না ওঠা পর্য্যন্ত

তাঁরাই তা'দি'কে কল্যাণবন্ধনে বেঁধে রেখে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বেন, এটিই মঙ্গল—এটিই স্বাভাবিক। কথায় বলে—

"ছেলে হবে বাপের বলবান বাহু,
মেয়ে হবে মায়ের গায়ের রক্ত;
সকল পরিবার মিলি' এক হবে—
গড়িবে জাতির বনিয়াদ শক্ত।"

এর পরে মানুষ অভিবাবকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাপ-মা নিজের চোখের সাম্‌নে তখন দেখবেন—ছেলে-মেয়ে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে—

"সত্য বল্‌ছে সোজা চল্‌ছে,
কর্‌ছে নাকো কারেও ভয়;
আপন কাজে আপনি স্বাধীন—
একে অন্যের বোঝা নয়।"

এরই ফলে জাতি জয়যুক্ত হবে—অভিভাবক দায়মুক্ত হবেন—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে জাতির জীবনে!

সাধারণের কথা

দেশের কথা আজকাল পথে ঘাটে মাঠে হাটে বাজারে ছড়ানো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিস্তি ঝাড়ুদার দেশের কথা কয়। খরিদদার, দোকানদার কেনা-বেচার সময় দরদস্তুর করার আগে দেশের কথা কইছে, দেখা যায়। বুঝে' না-বুঝে', ভেবে না-ভেবে এসব কথা তারা আলোচনা কর্‌ছে, সকলেই শোনেন। এলোমেলো ছড়ানো কথা কুড়িয়ে নিজের মনে জোড় খাইয়ে অনেক সময় তারা একটা ভুল ধারণা করে' বসে—সেটা ভাল নয়। দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারকের দল যদি মনোযোগ দেন ও দৃষ্টি

রাখেন এবং এ সম্বন্ধে তাদের একটা সত্য ধারণা দেবার ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন, তবে সমাজের অনেকখানি কল্যাণ হয়, আমরা মনে করি। যেমন অবনত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে উন্নত শ্রেণীর লোকরা কি ভাবে মেলামেশা কর্‌তে পারেন—তার রীতিপদ্ধতি কেমনতরটি হ'লে উভয় দলের মধ্যে খাপ খায় সে সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে যদি তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেন যাতে নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে আশা ও আনন্দের সঙ্গে তারা মনে বল পায়,—তবে জাতির পক্ষে অনেকখানি কল্যাণ হবে বলে' আমাদের বিশ্বাস।

শিক্ষা দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা ত আছেই, কিন্তু এতে অল্পসময়ে বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে সহজে একটা মোটামুটি উন্নতির ধারণা জন্মাতে পারে নিজেদের সম্বন্ধে। সমাজের পক্ষে এটা কম সুফল নয়। সমাজসেবকদেরও এ বিষয়ে আমরা মনোযোগ আর্কষণ কর্‌তে চাই।

৫

পংক্তিভোজে রকমফের

এদেশে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে পংক্তিভোজের চল ছিল না। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে অনেকে সে সংস্কার এখন ছাড়িয়ে উঠ্‌ছেন এবং গোঁড়া হিন্দুদের এজন্য সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বল্‌তেও কেউ ছাড়েন না। ভালই, কিন্তু ভেবে দেখেন যদি তাঁরা, আর একধরণের ভেদবৈষম্য ভোজন ব্যাপারে দেখা যায় না যে, তা নয়। ধনী-দরিদ্র পংক্তিভোজে বসা সর্ব্বদা সকলে দেখেন কি? উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা নিম্নপদস্থের সঙ্গে একত্র সার গেঁথে বসে' ভোজন করেন কি? এতেও মানুষে মানুষে কম ভেদ করা হয় না। দৈনিক ভোজে ও চলাফেরায় সকলে সমভাবে আহার-বিহার সম্ভব না হ'লেও ক্রিয়াকর্ম্ম পাল পার্ব্বণে, ছেলেমেয়ের বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবাদি ব্যাপারে এবং সাধারণ মেলামেশায় ধনীদরিদ্র যদি একত্র বসে' পদমর্য্যাদা ভুলে' এক

পংক্তিতে ভোজন করেন, তবে জাতিগত ঐক্যের একটি গোড়াবাঁধা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয় দেশে, আমরা মনে করি।

ধনী-ঘরণীরা সুদৃষ্টান্ত দেখিয়ে মেয়ে-মহলে এই ভেদবৈষম্য বিলুপ্ত করার চেষ্টা করুন,—নানা পথ দিয়ে মেলামেশায় দরিদ্র-গৃহিণীদের সমান আসন দিন্ নিজেদের সঙ্গে—বৎসরের মধ্যে যতবার পারেন পংক্তিভোজে বসুন তাদের নিয়ে। ধনী-দরিদ্রে ব্যবহার-ব্যবধান কম অনিষ্টকর নয় জাতির পক্ষে।

জাতির উৎকৃষ্ট নমুনা

নরনারীর সমান অধিকার নিয়ে আজকাল কথা উঠেছে দেশের মধ্যে। বিষয়টি আন্দোলিত হ'চ্ছে চারদিকে, শোনা যায়। 'সমান' না বলে' যদি 'নিজের' অধিকার' বলা যায় তা হ'লে কথার ভাবটী বোধ হয় আরো বেশী পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। দুটি মানুষের চেহারা যখন অবিকল এক নয়—মা মেয়েতেও নয়, বাপ-ছেলেতেও নয়, ভাই বোনেও নয়, তখন পুরুষ-নারী এই দুই জাতীয় মানুষের মধ্যে দেহে, মনে ও স্বভাবে অবিকল একতা সম্ভবপর কি করে? কিছু না কিছু প্রভেদ আছেই, সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। পুরুষ-নারী উভয়েই মানুষ বটে—কিন্তু ভিন্ন জাতীয় মানুষ। উভয়ের শারীরিক সৌন্দর্য্য যেমন ভিন্ন ধরণের মানসিক সৌন্দর্য্যেও তেমনি প্রভেদ থাকা সম্ভব—হয় তো বা উভয়ের কাজও কিছু বিভিন্ন। সমস্ত স্বভাবটি ফুটে উঠ্‌তে পেলে প্রত্যেকের বিশেষত্বটি সহজে ধরা পড়তে পারে ভালো করে' দশের মাঝে। পাখী যখন তার রঙীন পাখা মেলে হৃষ্টপুষ্ট চিকণ দেহটি নিয়ে দূরের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশপথে উড়ে চলে, তখন সে তার উৎকৃষ্ট রূপটি নিজে লাভ করে ও অপরকে দেখায়। আবার সে যদি অনাহারে

জীর্ণশীর্ণ ও ঝড় ঝাপটে মূর্চ্ছিত হয়ে, মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে, তবে তার সে দুঃখ পৃথিবী সইতে পারে কি?—নিজে ত তখন সে চেতনহারা। পাখী-জাতের উৎকৃষ্ট নমুনা যেমন ওড়া পাখী, মাটিতে পড়া পাখী নয়, পুরুষ নারী উভয়ে সমানভাবে সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলে তেমনি এ দুই জাতের মধ্যে এমন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নমুনার নরনারী দেখা যাবে যারা ফুটিয়ে তুলতে পারবে দুই জাতের বৈশিষ্ট্য সবার সামনে স্পষ্ট করে'। অতএব দুই তরফের সম্বন্ধে মনগড়া কোন বিশেষত্ব খাড়া করতে গিয়ে বৃথা কথা না বাড়িয়ে উভয় জাতিকে সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া হোক্ সুচারু রূপে; পরে 'ফলেন পরিচীয়তে।'

জাতির ভগবান

সকলে বলেন, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি,—তাঁদের পূজার জন্য হিন্দুসমাজটি কোটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা; এক করবে তাদের কোন্ পথ দিয়ে? কথা সত্য; কিন্তু সব দেবতা মিলে' একভগবান—এটি হিন্দুদেরই কথা, যদিও দেবতাবহুলতায় গোড়ার কথাটি চাপা পড়ে যায় অনেক জায়গায় ব্যবহারের সময়। বিপদে পড়'লে মানুষ গোড়ার কথাটার খোঁজ করে বেশী করে। আজকাল বিপদে পড়ে' গীতার ভগবানকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই জাতির ভগবান বলে ভাবতে ও মানতে সুরু করেছেন। এটি সৌভাগ্যের কথা। এক ভগবানে জাতির মিলন অনেক পরিমাণে সম্ভব।

ভগবানকে ডাকা কেন?

পাঁচটা কথার প্রসঙ্গে একদিন হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল—ভগবানকে ডাকা কেন? অনর্থক সময় নষ্ট হয় ঢের; দেশের কাজ এগোয় না তাতে একটুও। নূতন নূতন কারখানা স্থাপন, শিল্পশিক্ষালয় গঠন, ইস্কুল কলেজ

গড়ে' তুলে' দেশের মানুষ তৈরি করে তোলাই হ'চ্ছে আসল কাজ। যদি ভগবান থাকেন তবে তিনি তুষ্ট হবেন তাতেই।"

পাশের অন্য মানুষ বলে' উঠলেন—"তাই কি হয় হে! এতকাল ধরে' ভগবানকে মানুষ ডেকে এসেছে, সে কি খামোকা? মানুষের মর্ম্মগত অভ্যাস ভগবানকে ডাকা; তোমার কথায় হঠাৎ সেটা মানুষ উঠিয়ে দেবে বুঝি? আচ্ছা তোমার স্পর্দ্ধা দেখি!"

পূর্ব্বের লোক—"এতকাল ত ভগবানকে ডাক্‌লে, ফলটা পেলে কি? তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,—দেশের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! পৃথিবীর কাজে হেরে হেরে হয়রান হ'য়ে মরছ, মাথা তুলে' দাঁড়াতে পারছ কই? ডাকাডাকি বন্ধ রেখে এখন কাজে লাগো দেখি, বাপু!"

তৃতীয় আর এক ব্যক্তির দিকে চেয়ে দ্বিতীয় মানুষ: "তুমি বাপু জ্ঞানীও বটে সাধকও বটে, বল'ত হে ব্যাপারটা আসলে কি? তোমার কাছ থেকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তৃতীয় ব্যক্তি বললেন,—"নিজের শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম প্রকৃতিটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই ভগবানকে ডাকা, ভগবানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়। ডাকা না ডাকায় যিনি বাড়েন কমেন না তিনিই যে ভগবান একথা সকলেই জানেন। তেমন কোন কিছু না থাক্‌লে মানুষের শেষ বিশ্রাম বা শান্তির কোন পথ থাকে না—মানুষের কাছে নিজের অন্তরতম সত্তা বা আত্মার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় রূপটিও প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই এই প্রয়োজনটি সাধনের জন্য মানুষকে 'ভগবান,' 'ভগবান' বলে' নিজের অন্তরতম সত্ত্বাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয় নিজের অনুভূতির মধ্যে। জল, মাটি ও সূর্য্যকিরণ থাকা সত্ত্বেও যেমন লাঙ্গলের ফলা দিয়ে মাটি উখ্‌ড়িয়ে দিতে হয় ভালো করে' ফসল ফলাবার জন্য, তেমনি 'ভগবান' এই নামটুকুর সাহায্যে নিজের

অন্তরপ্রকৃতির শক্ত আবরণটুকু উথ্‌ড়িয়ে দিতে হয় অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকে প্রাণটি অঙ্কুরিত করে' তোলার জন্য।"

প্রথম ব্যক্তি বলে' উঠ্‌লেন—"চষে' মর সৌন্দর্য্যলোক, খুঁজে' ফের আত্মার প্রেরণা দিনরাত, দেশের তাতে হবে কি? দেশের মানুষগুলো কি দুর্গতি ভোগ করছে, চোখে দেখ্‌ছ ত? তাদের বাঁচাবে কি করে'? দেশের উন্নতির পথ কোন্ দিক দিয়ে? ডাকো ভগবানকে'—বাঁচুক তারা! দেখি দেশ বড় হয়ে মাথা তুলে উঠুক পৃথিবীর সামনে। আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন দেশের অনেক মানুষ, দেশটা তবু উদ্ধার হ'ল না কেন আজও? পাঁকে পড়ে' মুখ থুব্‌ড়িয়ে পচে' মরছে হাজার মানুষ;—সুন্দর ও সুস্থ করে' তোল দেখি তাদের? দেখি তোমার আত্মার সাধনবল। অন্তর স্বাধীন হ'লে বাইরের স্বাধীনতা পেতে বাকী থাকে কি আর এক মুহূর্ত্ত? পৃথিবীর কাজ করা চাই সবাই মিলে,'—তবেই উদ্ধার?—মনে মনে কোন কিছুকে ডাকাডাকির কর্ম্ম নয়।"

তৃতীয় ব্যক্তি শান্তভাবে বললেন—"পৃথিবীর কাজটা পাঁচজনে মিলে' করলে তবেই ত পৃথিবীর উন্নতি এগিয়ে চল্‌বে—একলা ত তুমি পারবে না, পাঁচজনকে ত চাই? ভগবানকেও তেমনি পাঁচজনে মিলে' একযোগে ডেকে দেখ দেখি কি ফল হয়। পৃথিবী শুদ্ধ লোক মিলে' পৃথিবীর উন্নতির চেষ্টায় লাগ্‌লে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবী হাজার বছরের উন্নতির পথে এগিয়ে পড়্‌বে। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ যদি একযোগে এক মুহূর্ত্ত ভগবানকে এক জেনে ডাক্‌তে পারে, পৃথিবীর অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকের দ্বার এক মুহূর্ত্তে উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে সবার সামনে বাইরেও, এবং মানুষের প্রতি কাজে পৃথিবী সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে গ্লানিমুক্ত হয়ে।"

প্রথম লোক: ঘটা শক্ত।"

তৃতীয় ব্যক্তি: "অসম্ভব নয়।"

নীতি-সমস্যা

ছোট থেকে শুনে এসেছি ও সৎগ্রন্থে প'ড়ে শিখেছি, "দুর্নীতি দূরে ফেলো, সুনীতির সঙ্গ কর, জীবনে সাফল্য লাভ করবে।" এতদিনের পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ মোড় ফিরে' মানুষের রাজ্যে এক নূতনতর ঢেউ তুলেছে—

"নূতন যুগের মানুষ যদি
সকল কথাই নূতন বল্,
বাঁধা পথের দিকটি ছেড়ে
যেদিক খুসী সেদিক চল্।"

—মানুষের এমনতরটি বলার কারণ আছে। অনেক দিন ধরে' অনেক মানুষ শেখা কথায় শিশুর মত পোষ মেনে থেকেছে,—শেখা বুলি তোতার মত আউড়েছে। ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে তারাই আজ বিদ্রোহের নিশান তুলে বল্‌ছে—

"ইহকালের সুখ হারালাম
পরকালের সুখের লোভে,
কাটিয়েছি কাল এম্‌নি কত
মর্‌ছি এখন তারি ক্ষোভে।
ইহকালে আমরা বড়
ইহকালে আমরা স্বাধীন,
নূতন যুগের এই কথাটি
সবার মুখে—শিশু-প্রবীণ।"

স্তোক-দেওয়া নীতিবাক্যের দোহাই মেনে ইহকালের কোন-কিছুকে মানুষ ছাড়্‌তে রাজী নয় আজ আর একটুও, একদফা তারা ঠকেছে বলে'।

গোল বেধেছে ঐখানে—বিরোধ করছে মানুষ ঐ জায়গায়। আর এই নিয়ে মানুষের ব্যস্ত থাকার অবসরে ফাঁক পেয়ে মানুষের গোড়াঘেঁসা প্রবৃত্তিগুলো স্বাধীন মূর্ত্তিতে দৌড় দিতে সুরু করেছে সদর রাস্তায়। ফলে সাধারণ মানুষ বিব্রত হয়ে পড়েছে তাদের দাপটে।

সাম্‌লে তুল্‌বে মানুষই আবার এগুলি সব সুন্দর ভাবে, নিজের স্বভাবের গুণে।

পশু-রাজ্যে যেমন বৈচিত্র্যের অভাব নাই—কেউ বা মাংস খায়, কেউ বা পাতা চিবায়, কেউ বা ঘাড় ভাঙে, কেউ বা মানুষের কোলে বসে' আদর কাড়ে; কেউ বা সুন্দর, কেউ বা ভীষণ চোখের কাছে;—এক বল্‌বার জো নাই তা'দি'কে কোন মতে; মানুষের স্বভাবেও তেম্‌নিতর বৈচিত্র্য ঘটে আস্‌ছে চিরদিন—নয় কি? সবাইকে এক শাসনবাক্য মানাতে গেলে, এক নীতিবাক্য শোনাতে গেলে প্রকৃতি-ভেদে মানুষের মন চাপে পড়ে' কখনো সুনীতিকে দুর্নীতি ও দুর্নীতিকে সুনীতি করে' তোলে স্বভাব-দোষে, স্বভাবগুণে।

দুর্য্যোধনের দুর্নীতি কিছুদিনের জন্য বড় হ'য়ে দেখা দিল দশের সামনে সে যুগে। কিন্তু তার শেষ হ'ল কোথায় গিয়ে, কে না জানে! পাণ্ডবের গৃহবিবাদে, আত্মীয়বধে দ্বিধাসঙ্কোচ সুনীতির সুন্দর ভাবটি প্রকাশ করে; দায়ে পড়ে' যুদ্ধ তাঁদের মনের সঙ্গে সায় দেয়নি আদৌ। ভীষ্ম দ্রোণ বধে, বিপক্ষ অর্জ্জুন শোকে কাতর হয়েছিলেন অনেক বেশী, স্বপক্ষীয় কুরুসন্তান দুর্য্যোধনের চেয়েও। সত্য নয় কি?—শোনাও দুর্য্যোধনকে সুনীতি! মরণ ছাড়া তাকে সুনীতি শেখায় কে?

> "মৃত্যু তার সে অধর্ম্ম করিল নিঃশেষ
> গাইল ধর্ম্মের জয় চিতাভস্ম শেষ॥"

রুচির রাজ্যেও মানুষের ভেদবৈচিত্র্য এর চেয়ে কিছু কম নয়। আহচ্চ

ক্রৌঞ্চের বেদনায় ব্যথিত বাল্মীকির সুন্দর গীতধারায় কোথাও সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা,—কোথাও অসংখ্য নরহত্যার পরে মানুষের আনন্দে উদ্দাম নৃত্য! মদবিহ্বল চিত্তে কোথাও মাতালের উন্মত্ত প্রলাপোক্তি,—কোথাও বুদ্ধের দিব্যমূর্ত্তির কাছে স্তব্ধ শান্ত আত্মহারা মানুষের গাঢ় স্বরে দুটি শান্তিবচন উচ্চারণ! অসংখ্য ভেদবৈচিত্র্য নিয়েই পৃথিবী চলে' আসছে এত কাল। এরি মধ্যে সে আত্মা বা সুন্দরের দেখা পেয়েছে থেকে থেকে —যার দৌলতে দুর্নীতি সুন্দর নীতিতে পরিণত হ'য়ে উঠে স্বভাবতঃ।

স্বভাবের পথ ছেড়ে শুধু শাসনের পথে মানুষকে কোন কিছু দেওয়া চল্‌বে না আর এ যুগে। ঘুরে ফিরে মানুষ স্বভাবগুণে নিজেই সুন্দরের দ্বারে গিয়ে পৌছবে,—কারণ সেটিও মানুষেরি স্বভাব। মানুষ শেষ পর্য্যন্ত থাকৃতে পারে না কোন অসুন্দর বা অকল্যাণের মধ্যে। অতএব ভয় নাই মানুষের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে। সারা দিন পথে ঘুরে ছড়ানো মানুষ ফিরে' আস্‌বে আবার নূতন করে' নিজের পুরানো ঘরে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা

স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফল্‌তে সুরু করেছে দেশে অনেক দিন থেকে। প্রথম যুগের ডাঃ কুমারী যামিনী সেন প্রভৃতির জীবন তার দৃষ্টান্ত। এই সুফলই এখন শতধা বিভক্ত হ'য়ে স্ত্রীশিক্ষার নানা প্রচেষ্টায় পরিণত হ'তে চলেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষিতা নারীদের উদ্যোগ ও সহায়তায় অনেকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে দেশের মধ্যে। সকল নারীর উন্নতির জন্য সমবেত ভাবে নারীরা চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

সদ্ভাবে কাজ পরিচালনা কর্‌তে পারাই শিক্ষার আদর্শ সুফল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এখনও ঢের কাজ বাকী আছে স্ত্রীশিক্ষা দেশব্যাপী কর্‌তে। অসংখ্য অন্তঃপুর-শিক্ষাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণ দেশব্যাপী

'হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্যে শিক্ষিতা নারীদের বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হ'তে হবে। যারা বাস্ ভাড়া দিয়ে যাতায়াতে অক্ষম ও সংসার ছেড়ে কতক ঘণ্টার জন্য বাইরে থাকা যাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, গ্রামে ও সহরে পাড়ায় পাড়ায় তাঁদের জন্য কতকগুলি অন্তঃপুর-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ ও আর্থিক সাহায্য করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত যদি পাড়ার স্থানীয় কোন শিক্ষিতা মহিলা এর ঝুঁকি নিয়ে কার্য্যপরিচালনায় তৎপর হন। এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রের কত প্রয়োজন, শিক্ষিতা নারীরা অল্প চিন্তাতেই বুঝ্তে পারবেন।

পথকণ্টক

আজকাল দেশের অসংখ্য মেয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন— অধিকাংশ উপার্জ্জনের জন্য, কতক সমাজসেবা ও দেশের অন্যান্য কাজে। অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা এই উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। বাইরে কাজে আস্তে গেলে পুরুষের সঙ্গে নারীর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সাহিত্যের একদল তরুণ সেবক বিদেশী অনুকরণে নরনারীর সম্বন্ধকে রুচিবহির্ভূত করে' চিত্রিত করতে সুরু করেছেন। তাতে লেখার আর্ট বা কায়দা কিছুটা প্রকাশ পেলেও মানুষের মনকে পীড়িত করছে খুব বেশী। দৃষ্টি কলুষিত হ'লে পুরুষের সঙ্গে যোগে কাজ করা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে—বিধবাদের ত কথাই নাই। কাজের পথে মেয়েদের চলাফেরায় এগুলি পথকণ্টক নিঃসন্দেহ। দেশ বিপর্য্যস্ত, চারিদিকে নূতন গঠন চল্ছে, এ সময়ে সকলেরই সাবধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ভাবতে গেলে আরও দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই এই সকল নাটক নভেলে চিত্রিত চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও

অস্বাভাবিক। দৈনিক জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল—এমন কি আদৌ নেই বল্‌লেই হয়। দেশের এই দুঃসময়ে কল্পিত এসব মায়াচিত্র এঁকে দেশের মধ্যে নারীদের চলার পথকে পঙ্কিল করে' তোলার সার্থকতা কি? তরুণ দল এ কথায় ক্ষুব্ধ হবেন না; দেশমাতার প্রতি ও নিজ নিজ গর্ভধারিণী জননীর প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করে' নারীজাতির কল্যাণের জন্য সাহিত্যের মধ্যে এই অমার্জ্জিত কাঁচা সুরটুকু আমদানি করায় নিরস্ত হোন, এই প্রার্থনা।

গ্রামের কাজে নারীর হাত

রব উঠেছে চারদিকে—সহরে বাস আর চল্‌লো না—পালাতে হ'ল গ্রামে এবার সবাইকে। সকলের মুখে একই বুলি—টাকা ভাঙিয়ে খাওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। টাকাই নেই, বারুদের ফাঁকিতে নস্যি হ'য়ে টকোগুলো সব উড়ে গেছে শূন্যে,—ভাঙাবে এখন কি? যাও গ্রামে,—মাটিতে ছুটো শাক-সব্জী মুলো-বেগুন ফলাও,—পুকুরে মাছ ধরো,—খেয়ে বাঁচো সবাই মিলে'। এই সোজা কথাটিকে আজ আর কারো অস্বীকার করার যো নাই, যেতে হ'লো গ্রামে,—বাঁধ্‌তে হল বাসা সহর ছেড়ে।—অল্প আয়ের স্বামীদের স্ত্রীরা সঙ্গিনীরূপে সহযোগিনী হ'য়ে, স্বামীদি'কে আজ গ্রামের বসবাসে সাহায্য করুন সর্ব্বতোভাবে। ভয় নাই, গ্রামে গেলে গ্রাম্যতাদোষ স্পর্শ কর্‌বে না,—গ্রামগুলি এখন সহর হ'তে চলেছে দিনে দিনে। সহরের মেয়েরা ও বাবুরা গ্রামে গিয়ে গ্রামগুলিকে শিক্ষায় সহুরে ও বিলাসিতায় বেসহুরে করে' তুলুন নিজগুণে। তবেই সকলে সুখে থাক্‌বেন সপরিবারে।

সহুরে মেয়েরা গ্রামে যেতে নিতান্ত নারাজ, বাবুরা তাই সাহস পান না গ্রামে যাওয়ার কথাটা তাদের কানে তুল্‌তে। মেয়েরা এখন স্বেচ্ছায়

সহর ছাড়তে প্রস্তুত হোন্,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিন,—সুখের সংসার সৃষ্টি করুন গ্রামে গ্রামে। শিক্ষিতারা নিজের ও গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন গ্রামে গিয়ে। শিল্প-বিদুষীরা শিল্পচর্চ্চার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করুন গ্রামের ঘরে ঘরে—নিজের মনের মত করে' গড়ে' নিন গ্রামের চারপাশটাকে। অধিকাংশ যুবক বিবিবৌয়ের ভয়ে বিবাহে বিমুখ। যুবকদের মন থেকে বিবাহের বিভীষিকা দূর করে' দিন নিজেদের কাজ দেখিয়ে।

সহুরে স্বামী নিয়ে সময়ে সময়ে মেয়েদের দুঃখও কিছু কম হয় না—ভেবে দেখুন তাঁরা নিজের মনে। বাজে কাজে বাহিরে ঘোরা স্বামীদি'কে ঘরে পাবেন তাঁরা গ্রামে গেলে বেশী সময়।

অসচ্ছলতার ফলে আজ বহু সংসার বিধ্বস্ত—দুশ্চিন্তায় মানুষের মন বিকৃত।

"অসচ্ছলের অট্টালিকা হোক্ না ভূমিসাৎ,
সচ্ছলতার মাণিক-কোঠা গড়ুক্ নারীর হাত।"

সভ্যতার গোড়ার বাঁধন

এদেশের অতি আধুনিক মানুষদলের কেউ কেউ বিদেশের বর্ত্তমান লণ্ডভণ্ড সভ্যতার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে সুরু করেছেন,—'প্রাচীন সব কিছু চুরমার করে ভাঙো—ভিৎ শুদ্ধ উপড়ে ফেলো,—আগাগোড়া নূতন করে' গড়ে তোলা যাক নূতন যুগে'—তাদের মতে সভ্যতার গোড়ার বাঁধন বলে' কোন কিছু নাই, থাকতে পারে না। বর্ত্তমানে দু'চথে যা' দেখ তাই হাওয়ার ভরে ভেঙে' চুরে' উড়িয়ে দিয়ে যা'খুসী তাই করে' চুকিয়ে ফেলো জীবনের সব কিছু কাজ।

এই ভাবে যাঁরা ভেবে চলেচেন, নিজের জ্ঞানে তাঁরা এগিয়ে চলুন

যতটা পারেন, তাঁদিকে বলার কিছু নাই, কিন্তু যাঁরা আগু-পিছু ভাবেন, একটি কথার সঙ্গে আর একটি কথা, একটি ভাবের সঙ্গে আর একটি ভাব, কাজের সঙ্গে কাজ যাঁরা মিলিয়ে দেখেন এবং পৃথিবীর সব মানুষের সকল রকম জ্ঞানকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, মানবসভ্যতার যুগপরম্পরাগত স্থিতি ও গতির মধ্যে তাঁরা একটি আশ্চর্য্য মিল দেখতে পান। আজ তাঁদেরই চিন্তাকে অনুসরণ করে' দেখা যাক্।

কোন কিছুকে হুড়্মুড়্ করে ভাঙার জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, আর্ট, কলাকৌশল, গঠননৈপুণ্য কোন কিছুরই দরকার করে না; আসুরিক বল, পাশবিক ভাঙন-ভাঙ্গী—সঙ্গে খানিকটা খেয়ালের ঝোঁক থাকলেই ভাঙনের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু গড়া ব্যাপারটি তত সহজসাধ্য নয়, তার মূলে অনেক তপস্যা, সাধনা, চিরন্তন সত্যের গভীর উপলব্ধি, জ্ঞানের প্রখর আলো, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি নানা সরঞ্জামের দরকার করে যথেষ্ট পরিমাণে। তার সবগুলি আয়ত্ব করা একজন মানুষের একজীবনের কাজ নয়। বহু মানুষের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যোগাযোগই একটি উৎকৃষ্ট সভ্যতা গড়ে' তুল্‌তে সক্ষম হয়।

পৃথিবীর পথে চল্‌তে চলতে মানুষ যখন মানুষে মানুষে তাদের জ্ঞানে ভাবে জড় চেতনে, জলমাটি আকাশ বাতাসে, প্রাণীদের প্রাণ উদ্ভবে, তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুর গতিবিধির মধ্যে মিল দেখতে পেল তখনই সভ্যতার গোড়াপত্তন হ'ল মানুষ সমাজে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত বিচিত্রতর মূর্ত্তিতে সভ্যতা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, হাজার মানুষ নিজেদের বিচিত্র উপলব্ধিকে জুড়ে দিয়ে চলচে সভ্যতার সেই গোড়ার বাঁধনের সঙ্গে সব কিছুকে এক করার সাধনার মধ্য দিয়ে। খৃষ্টানী সভ্যতা তাই সকলকে খৃষ্টান করে' সুখ পায়। ইস্‌লামী সভ্যতা বিশুদ্ধ এক সত্যের ধারণা দিয়ে সকলকে মুসলমান করতে চায়। বাকি থাকে ব্রাহ্মণসভ্যতা—অসংখ্য

ডালপালা ছড়ান হিন্দু-সভ্যতার যেটি মূল—তার বিশ্ব-চৈতন্ত-বোধ বা চৈতন্তের অভেদ-দৃষ্টির রহস্তময় উপলব্ধিটি সে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েচে আজ পৃথিবীর অন্ত সভ্যতাগুলির কাছে বিশেষভাবে। টেনে তুলতে হবে মানবজাতীর সেই প্রাচীনতম সভ্যতাকে, কালের ঘোরে ক্ষয়ে যাওয়া তার গোড়ার বাঁধন-সূত্রটিকে তুলতে হবে মেজেঘসে' ঝকঝকে সোণার পাতের মত করে, খুলে দিতে হবে তার লুকান দুয়ারটি সকল জাতির সকল মানুষের চোখের কাছে। পরে পরে আসা সকল সভ্যতার মিল ঘটাতে হবে তার সঙ্গে সহজজ্ঞানে সদররাস্তায়। তবেই পৃথিবীর নূতন ভবিষ্যতে গড়ে' উঠবে এমন একটি উৎকৃষ্টতর নূতন সভ্যতা, যার প্রতি অঙ্গে সাজান থাকবে নূতন-পুরাতনের থাপে থাপে আশ্চর্য্যতর মিল।

দেশ বিপর্য্যস্ত,—মানুষের মন অস্থির,—পুরুষদের বিভ্রাটে মেয়েরাও ভাবছেন ও ভুগছেন কিছু কম নয়। সব কথা সকলকে ভেবে দেখতে হবে আজকার দিনে। দেশ, সমাজ, পরিবারে পরিবর্ত্তন আনতে হবে নানা দিক থেকে। সকলে একমন, একমত, এক বুদ্ধিতে একজোট হোন এই প্রার্থনা। শেষে ভগবানের ইচ্ছা জয়যুক্ত হবে, একথা তো পড়েই আছে।

ছোঁয়ার বাধাই কি সব ?

ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নিয়ে আজকাল কি রকম আন্দোলনের ধূম চলেছে, সবাই জানেন। মেয়েরাও ঘরে বসে এ বিষয়ে বলাবলি করছেন নিজেদের মধ্যে অনেকে অনেক কথা। একদল নিষ্ঠাবান হিন্দুর মেয়ে বলচেন, অস্পৃশ্যতা ঘুচে গেলে, ছোটজাতের ছোঁয়া নিতে হলে, জাত যাবে, জন্ম ব্যর্থ হবে আমাদের ; কোথায় যাই বাপু এই সব অঘটন ঘটানোর জ্বালায়। বাড়ীর বাবুদের মুখে শুনে ও দৈনিক কাগজগুলিতে

পড়ে' যাঁরা কতকটা বুঝতে শিখেছেন ও ভাবতে চাইচেন তাঁরা বলচেন—কাউকে ফেলা কি যায়! নিয়ে চলতে হবে সবাইকে। ওরা দোষ করেছে কি যে আস্তাকুড়ে দাঁড়াবে, দূর থেকে ভিক্ষা মাগবে—যেন ওরা মানুষই নয়। না বাপু,তা' হবেনা, ওদের দূরছাই করলে, ঘৃণা করে তাড়ালে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে ষোল আনা। বাবুরাও বলচেন, ওদের নিয়ে চলো তোমরা, তাতে জাতির মঙ্গল হ'বে, ভগবানের প্রসাদ পাবে, উন্নতি হবে সবদিকে তোমাদের।

বাবুদের মতেই তো আমরা সব কাজ করে' থাকি! এ কথাটা তাঁদের না শুনি কেন? তাঁরাই তো আমাদের সব—রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা—সমাজনেতা। শেষের কথাগুলিও নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের মেয়েদেরই কথা। এসব আলোচনায় তাঁদের অধিকারও আছে ভাবনার মূল্যও আছে। এঁদের মধ্যে কথাগুলি প্রবেশ করলে তবেই জাতি হৃদয় দিয়ে কথাটি গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। মেয়েরাই যে জাতির হৃদয়, কে না জানে! তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী একটি মেয়ের মুখে শোনা গেল "অ-ছোঁয়া জাতের মানুষদিকে শুধু অন্ন ও শরীর ছুঁতে দিলেই কি সব হবে? সৎসংস্কার ও উচ্চ ধারণা দিয়ে এবং পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করিয়ে কালক্রমে তাদিকে উচ্চবর্ণের সামিল করে' তোলার ব্যবস্থা কই? সেটা না হ'লে, তারা যে থাটো সেই থাটোই থেকে যাবে। শুধু এটুকুতে তাদের মনুষ্যত্ববোধ জাগবে কি! অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকই তো আজ কাল নীচু জাতের ছোঁয়া খেতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাতে বাবুর্চ্চি, খানসামা, আয়া, বেয়ারার দু' দশটা কাজ পাওয়া ছাড়া উন্নতির আর কোন পথ তারা খুঁজে পায় কি বাবুদের খানা ছুতে পায় বলে? শুধু ছোঁয়াছুঁয়ী নিয়ে হৈচৈ করলেই সব হবে না; উঁচু নীচু সবাইকে একটা কথা মানতে হবে, একটি মন্ত্র জপ্‌তে হবে,—

"এক ভগবান, সবাই সমান—"

ছোটদের এ ধারণা পরিষ্কার নয় বটে, বড়দেরই কি এ ধারণা স্পষ্ট! এক ভগবানে মিলতে পারলে তবেই মেলা সার্থক"

বুদ্ধিমতী মহিলার কথাগুলি নত মস্তকে মেনে নিলুম,—উচ্চবর্ণের মানুষরা—অ-বর্ণদের শুধু ছুঁয়েই থেমে যাবেন না, নিজেদের ধর্ম্মসঙ্গত উচ্চ দীক্ষায় তাদের দীক্ষিতও করবেন, নিঃসন্দেহ।

সন্ন্যাসিনীর স্বাধীনতা

চলার পথে একদিন এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা; সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনী ভোরে চলেছেন সমুদ্র-স্নানে। আমরা একদল মেয়ে চলেছি সেই ভোরে সমুদ্রের হাওয়া খেতে ও কিছুক্ষণ তীরে ঘুরে বেড়াতে। সূর্য্যোদয়ের তখনও অনেকক্ষণ বাকী। ঝাপসা অন্ধকার তখনও পথঘাট ঢেকে আছে। সন্ন্যাসিনীর গতিভঙ্গী দ্রুত ও আশপাশের প্রতি ভ্রুক্ষেপশূন্য। চোখ পড়তেই আমাদের মনটা টানল তাঁর দিকে। পথ চলছি তাঁর মূর্ত্তি অনুসরণ করে; পৌঁছলুম গিয়ে সমুদ্র কিনারায়। ভোরের দিকে শান্তমূর্ত্তি তখন সমুদ্রের, সন্ন্যাসিনীর পরণে গেরুয়া ছাড়া ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষের মালা, জটা, প্রভৃতি সন্ন্যাসের আর কোন চিহ্ন তাঁর অঙ্গের কোনখানে নাই। জল থেকে অনেকটা দূরে হাতের একটা পুঁটলি নামিয়ে, তিনি সোজা গিয়ে নামলেন জলে—ঐ ভোরে। অনায়াসে সমুদ্রের অনেকটা ভিতরে গেলেন চলে, বোঝা গেল সমুদ্রস্নানে তিনি বেশ অভ্যস্ত।

গ্রীষ্মকাল, ভোরে সমুদ্রের হাওয়া যেমন আরামের সমুদ্রস্নান ততোধিক; আমরা চেয়েই আছি সন্ন্যাসিনীর দিকে—চোখ ফেরাইনি মুহূর্ত্তের জন্যে, অনেকক্ষণ সন্ন্যাসিনী জলে রইলেন, পরে স্নান সেরে

তীরে উঠে পুঁটলি খুলে একটি গেরুয়ার ছোপান গামছার মত টুকরো কাপড় বের করে গা মাথা মুছে, ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো আর একখানা গৈরিক পরলেন। ভিজে কাপড়খানা নিংড়ে গামছা সহ, পাশে একখণ্ড কাঠের টুকরো পড়েছিল—তার উপর রেখে, পূব দিকে মুখ করে বসলেন,—মনে হোল জপ করছেন।

আমরা ছিলুম খানিকটা দূরে, বেড়ান ভুলে সবাই মিলে বসে পড়লুম সেই জায়গায়। পূব আকাশে দেখা দিল আলোর রেখা, পথঘাট নজরে পড়ল ঝাপসা অন্ধকারের ঘোর কেটে। দেখা গেল সন্ন্যাসিনী বুকে হাত রেখে সত্যই জপ করছেন—এতক্ষণে সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তিটী স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল আমাদের চোখে—সুন্দর দিব্যশ্রী মাখান মূর্ত্তিখানি, অনুমান বয়স পঞ্চাশ। দেখতে দেখতে সূর্য্যোদয় হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনী জপ বন্ধ করে চোখ চাইলেন—আমরা উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চল্লুম তাঁর দিকে, কাছে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ায়ে তিনি হাত নেড়ে বল্লেন, "বোস", আমরা বল্লুম, "আপনি সন্ন্যাসিনী, তপস্যা সাধন ভজন আপনার ধর্ম্ম, মেয়ে জাতের আপনারা গুরুস্থানীয়া, আপনার কাছে কিছু উপদেশ পেতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাস নিয়ে আপনি কি পেয়েছেন মা, আমাদের বলুন, পারি তো আমরাও নেব।"

সন্ন্যা। "সন্ন্যাস নিলে পাওয়া যায় স্বাধীনতা।"

আমরা। "আপনি কি স্বাধীনতা পেয়েছেন?"

সন্ন্যা। "না এখনও পাইনি, পেতে চেষ্টা করছি।"

আমরা। "স্বাধীনতার সুখ কতখানি?"

সন্ন্যা। "অপরিসীম।"

আমরা। "এদেশের মেয়েরা তো অন্তঃপুরে চিরবন্দিনী—আপনি তার মধ্যে থেকে স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন কি করে?"

সন্ন্যা। "এদেশের সন্ন্যাসিনীদের স্বাধীনতা তো চিরপ্রশস্ত।"

আমরা। "সে তো ঘর ছাড়লে, দীক্ষা নিলে, মন্ত্র সাধলে, গেরুয়া পরলে, সম্প্রদায়ে ভুক্ত হলে,—তবে। তা ছাড়া তো নয়।"

সন্ন্যা। "না, তা ছাড়াও সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়—ভয় ছাড়লে—অবশ্য সঙ্গে সাধনা থাকা চাই। আমি কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী নই।"

আমরা। "তবে কি নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন আপনি?"

সন্ন্যা। "শুধু ছাড়তে শিখে,—ত্যাগ-পন্থী হয়ে।"

আমরা। "কে আপনাকে সে পথ দেখালে?"

সন্ন্যা। "নিজকে নিজে। আমার জীবনের কাহিনী অনেক। এখন সে সব বলার সময় নাই।"

আমরা। "নিজেকে নিজে আপনি কী ছাড়তে শেখালেন?"

সন্ন্যা। "মিথ্যাচরণ।"

আমরা। "শুধু মিথ্যা ছাড়লেই স্বাধীন হওয়া যায়?"

সন্ন্যা। "হাঁ"

আমরা। "কেমন করে মিথ্যা ছাড়ব?"

সন্ন্যা। "যতটুকু জানবে ততটুকু বলবে; যতটুকু বুঝবে ততটুকু করবে—তার একচুল বেশীও নয়, কমও নয়।"

আমরা। "এই ভাবে চললেই আমরা স্বাধীন হতে পারব?"

সন্ন্যা। "হাঁ"।

আমরা। "জানাটাকে বাড়াতে হবে তো দিনে দিনে?"

সন্ন্যা। "প্রতি মুহূর্ত্তে।"

আমরা। "বুঝতে হবে তো সব কিছুকে ভাল করে?"

সন্ন্যা। "নিখুঁত করে—যতদূর পারা যায়" বলেই সন্ন্যাসিনী

উঠে দাঁড়ালেন, কথা বলার ও শোনার সুযোগ দিলেন না আমাদিগকে আর একটুও—সোজা চলতে লাগলেন সামনের রাস্তা ধরে।

তাঁর চলা ফেরার ভাবটি এমনই দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক যাতে তিনি ইচ্ছা না করলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না।

গ্রামের ভদ্রলোক

বাঙ্গালী-সমাজে সচরাচর দুই শ্রেণীর ভদ্রলোক দেখা যায়। এক উন্নত শিষ্টাচারে ও বড় দরের আদব কায়দায় অভ্যস্ত, কেতা দুরস্ত সৌখীন রুচির সাবধানী সহুরে ভদ্রলোক। আর এক শ্রম-সহিষ্ণু কর্ম্মনিপুণ সরলপন্থী 'ভূমি-জীবী' দশের দরদী অপেক্ষাকৃত মোটা চালের গ্রামের ভদ্রলোক। সভ্যতার উঁচু বৈশিষ্ট্যটুকু হারাবার ভয়ে প্রথমোক্তরা সাধারণের ভীড়ে ভিড়তে রাজী হন না আদৌ। তাঁরা সাবধানে বাঁচিয়ে চলেন নিজের চালচলনকে হেটো মানুষের হট্টগোলের হৈ হৈ থেকে। এঁরা সমাজের উপরিতলে বাস করেন। এঁদের মধ্যে উচু দরের মানুষ আছেন অনেক; তাঁরা সময় সময় দান করেন যথেষ্ট কিন্তু দরদ দেখাবার সুযোগ পান না সব সময় প্রাণে দরদ থাক্‌লেও উপর তলায় বাস করেন বলে।

শেষোক্ত মানুষরা সহজে এগিয়ে যান দশের দিকে—মিলিয়ে নেন নিজের সঙ্গে দশজনকে। এই ধাতের মানুষরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে নিজেরাও যেমন কাজ করতে পারেন বেশী সাধারণ মানুষদের দ্বারা কাজ করিয়েও নিতে পারেন সেই ওজনে। এই শ্রেণীর মানুষ দেশে ইদানিং ক্রমেই কমে যাচ্ছিল;—ধন হলেই সৌখীন ধনীর দলে মিশে সহুরে হয়ে যাবার দিকে ঝোঁক বেড়ে চলছিল অনেকেরই মধ্যে দিন ফিরেছে; গ্রামের গৌরব ফি'রে আসছে মানুষের মনে। অর্থাভাবের

উৎপীড়নে গ্রামে লক্ষ্মীর মরাই বাঁধতে ব্যস্ত হয়েছেন এখন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রায় সকলেই।

অদ্ভুত কর্ম্মী সবাই নয়

অদ্ভুত কর্ম্মী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা পৃথিবীতে দু'দশজনের বেশি নয়, অথচ তাদেরই নাম ছবি ও কাজের খবরে ভরা থাকে দেশের মাসিক পত্রিকা ও দৈনিক কাগজগুলির অধিকাংশ স্থান,—দেশের কয়েকটি বুদ্ধিমান ছেলে দল বেঁধে এসে একদিন এই অভিযোগ জানালো। তাদের মতে সাধারণ বুদ্ধির ছেলে মেয়েদের কিসে উন্নতি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কি ভাবে তারা দেশে ছোট ছোট কাজের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারবে সে সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে কম আলোচনা হয়। তারা বলে, অদ্ভুত কর্ম্মীরা একাই একশো, নিজের শক্তিতেই তারা জাহির হয় ষোল আনা, তাদেরও জাহির করে দেওয়া সংবাদিকদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যারা একা একটি দশেমিলে তারা কেমন করে একটি বড় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তার সমীচিন আয়োজন কই দেশের মধ্যে? আন্দোলন আলোচনাই বা কই যথেষ্ট পরিমাণে? এই সব ছেলেরা দল বেঁধে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার নিতে চায় একাই সর্ব্বেসর্ব্বা হবার দুরাশা না রেখে। মুরুব্বি খুঁজে ফিরছে। মতের দলে না ভিড়িয়ে এদের কাজের দলে ভিড়ানের দরকার। দেশের ধনী সম্প্রদায় আজ অনাদায়ের দায়ে বিপন্ন, অর্থাগমের পথ দেখাতে হবে যখন তাঁদিকেও তখন তাঁরা যদি সামান্ত কিছু মূলধন হাতে নিয়ে অথবা দু'পাঁচশ বিঘে জমি কিনে সহজে কাটতি হয় তেমনতর ফসল ফলিয়ে একদিকে ছোট ছোট কারবার, অন্তদিকে চাষ আবাদের ক্ষেত্র গড়ে তোলেন তবে ঐ

সব শিক্ষিত বেকার ভদ্রসন্তানদের কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট সুফল লাভ করতে পারবেন নিজেরাও, ছেলেদেরও উপকার হবে অনেকখানি।

খাপ ছাড়া দল

সমাজ মানুষকে সামলে রাখে অনেক খানি। পারিবারিক প্রভাব তাদের বাঁচায় আরো বেশী। এ দুই থেকে যারা ছিটকে পড়ে—পাঁচ জনের সুখ সৌভাগ্যের ভাগ জোটেনা যাদের কপালে—সেই সব দল ছাড়া বে-খাপ্ মানুষদের সম্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা করতে চাই। তাদের মধ্যে এমনতর পুরুষ নারী অনেক আছে, যারা দশের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে নারাজ অথচ ঘটনাচক্রে কিম্বা অদৃষ্টের ফেরে গিয়ে পড়েছে দশের বাইরে। সম্প্রতি তেমন কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে। তাই তাদের কথাটা মনে জেগেছে বেশী করে। তারা বলে, চলতে হয় তাদিকে নিজের মতে, কাজ করতে হয় নিজের বুদ্ধিতে, দুঃখ ভোগ করতে হয় নিছক নিজেরই অদৃষ্টের পরিধীটুকুকে আশ্রয় করে। তারা কে, থাকে কোথায়, সে পরিচয়ের প্রয়োজন তত নাই, তারা চায় কি সেই কথাটা জানার যত প্রয়োজন। খেতে পেলে, পরতে পেলে, এমক কি লিখতে পেলে, চাকরী পেলেও তাদের গোড়ার অভাব অসুবিধা ঘোচেনা—যদি না তারা সমাজবদ্ধ হতে পারে। তারা চায় সমাজ। নিজের বোঝা মাথায় নিয়ে খাড়া হয়ে সোজাপথ চলতে কোমর যখন ভেঙ্গে আসে, পিঠ যখন বেঁকে পড়ে, ঠেশ দেবার স্থান না থাকায় সদর রাস্তায় তারা তখন মূর্চ্ছা যায়। মৃত্যু হলে সরকারী গাড়ী দেহখানি বহন করে। একাকীত্বের এই পরমদুঃখ তাদের কাছে সব চেয়ে বড়। তারা চায় সজন, বান্ধব, আত্মীয় সমাজ। কথাগুলি ঐ দলের ভদ্র ও শিক্ষিতদের নিজের মুখের। কে তাদিকে সমাজভুক্ত

করে, তাদের জন্য স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তোলেই বা কে ! সময় এসেছে, যখন দেশের সুবুদ্ধি-সম্পন্ন হৃদয়বান মানুষরা সকল স্তরের মানুষের জন্য সুব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভগবানের প্রেরণা পেলে সৎ মানুষের সহায়তায় এই বেথাপ্ দলও খাপ্ খেয়ে যেতে পারে এ সময় সমাজের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে, আশা করা যায়।

সমাজকে আজ কবির কথায় বলতে হবে—

"যে চায় সে জন যেন ফিরে নাহি যায়

প্রত্যাখ্যান না করি তাহায়, দাও সবে কোল—"

আমাদের পরিচিত এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান চাকরী করতেন মিলিটারী বিভাগে, থকেতেন পুরোদস্তুর সায়েবী কায়দায় সপরিবারে। বাঙ্গালার বাহিরেই তাঁর আজীবনের কার্য্যক্ষেত্র, ফলে দেশ ও দেশী সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না বড় একটা। শেষ বয়সে মনে হোল তাঁর, আমি কোন সমাজের মানুষ, কোন সমাজ নেবে আমাকে ? এই বিদেশীর মধ্যে মরলে আমায় দেশী প্রথায় দাহ করবে কে ? দূর হোগ গে—আমি হয়ে যাই ক্রীশ্চান ; এদের ধর্ম্ম-ভাই হলে এরা আমাকে যত্ন করে কবর দেবে। এই ভেবে শেষ বয়সে তিনি সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। এই ঘটনায় ছেলে বুড়ো আমাদের সকলের কিছু শেখাবার আছে। সমাজের ভর করা ছাড়া মানুষের মন তিষ্ঠতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত সমাজের বাঁধন মেনে চলা চাই সকলের।

পুরাণ সমাজের ঘুনে শেখা মরচে ধরা ক্ষয় পাওয়া সংস্কারগুলো আঁকড়ে থাকলে খসে পড়ার সম্ভাবনা যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে, নূতন প্রাণের সাড়া জাগানো, জ্ঞানগত, বিচার সঙ্গত নূতন সমাজ গড়তে না পারলে উড়ো হাওয়ায় পাক খেয়ে ছন্নছাড়া হয়ে মানুষের ছত্রিশ দিকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ততোধিক। কথাটা ভেবে দেখা ভাল।

সম্মানে বিপত্তি

দেশের গুণী জ্ঞানী মানুষদিকে সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় করে' তোলার ফলে সারা দেশটাই বড় হয়ে ওঠে, জাতির গৌরব বাড়ে, একথাটা দেশের মানুষ বুঝেছে—তাই দেশে সম্মান সম্বর্দ্ধনার ধুম পড়ে গেছে আজ-কাল খুব বেশী। প্রথমটি সুন্দর ও মঙ্গল-জনক, সন্দেহ নাই। জাতির কল্যাণ তো বটেই তাছাড়া মানুষ মানুষকে অন্তর দিয়ে সম্মান করতে পারলে মনে সুখও পায় অনেকখানি। অতি-অসাধারণ মানুষরা পৃথিবীতে চিরদিনই পূজা পেয়ে এসেছেন। তাঁদের জীবনের প্রভাব ঠেকায় কে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে যাঁরা একটুখানি বিশেষ, তেমন ছোটদরের গুণীদের গুণগুলিও ফেলার জিনিষ নয়। আগের কালে তেমন ছোটদরের গুণী দেশে জন্মেছিলেন অসংখ্য, খুসী করতে ও আনন্দ দিতে পারতেন তাঁরাও আশপাশের দু'পাঁচ জনকে নিজের গুণেভরা হৃদয়খানি দিয়ে। বাউল বৈষ্ণব সাধু ফকির গৃহস্থ জমিদার কাঙ্গাল ভিখারীর গুণের কত টুকরো কাহিনী ছড়িয়ে আছে দেশের ধূলায়, মাড়িয়ে চলে সবাই সেগুলি যাতায়াতের পথে। ছোট কথায়, ছোট গানে ছোট কাজে তাঁরা নিজেদের কত ছোট চিহ্ন রেখে গেছেন দেশের বুকে—হারিয়ে গেছে তার ছোট সূত্রগুলি, মন ব্যথা পায় তাঁদের সে হারাণো গুণের কথা স্মরণ করে। রেলপথ, ডাকঘর, ছাপাখানা তারের ব্যাপার না থাকায় তখন তাদের পরিচয় পায়নি সকল মানুষে। মানবসৌভাগ্যে আজ ছাপাখানার সৃষ্টি ; তার দৌলতে মানবগুণের কথা ছড়িয়ে পড়ছে দেশ বিদেশ এক মুহূর্ত্তে। গুণী মানুষ নিজের পাওনা গুণে নিন—ওজন দরে মেপে নিন—কম না পড়ে কোন দিকে।

পথ চলে এলো এতদূর সুখে সুন্দর হয়ে, এবার বাঁক ফেরার পালা। এখন দেখা যা'ক বিপত্তি এর কোন্‌খানে। হঠাৎ সম্মানের বেড়া পড়লো

গুণের চারপাশে, গুণীর মন পাক খেয়ে-ঘুরতে লাগলো বেড়ার চারদিকে, সুরু হল উল্টা যাত্রা। গুণীর মন তখন নিজের গুণ দেখে, নিজের গুণের কথাই ভেবে দিন কাটায়। অসাবধানে মন কখন উল্টা পথে বাঁক ফিরেছে খেয়াল না থাকায় সম্মানের ভাগ কমতি হ'লে গায়ের জোরে মান বাড়াবার প্রবৃত্তি হয় প্রবল। ফলে শুকিয়ে ওঠে গুণের রসভাণ্ডার। সাবধান না হ'লে বিপত্তি বেড়ে ওঠে এখানে ঘোরতর।

"দশে মিলে গুণ দেখালে করলে মাল্যদান,
নিজের দিকে চোখ ফেরালে ঘুচবে সে সম্মান।
দেবার যা তা' দিতেই হবে লুকাবে কোথায়
সাবধানে পথ চলতে হবে ঠেকিয়ে মানের দায়।"

দেশের কাজে মেয়েরা আজ কিছুটা যোগ দিয়েছেন, দেশে তার সুফল ফলছেও কিছু কিছু! ক্রমে তাঁদেরও সম্মান পাবার পালা পড়বে, বিপত্তি বাঁচিয়ে যাতে তাঁরা পথ চলতে পারেন তারই জন্যে আজ এখানে এ কথার অবতারণা।

ফল ফলানো

দেশের অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে গিয়ে নূতন বিদ্যা, নূতন জ্ঞান— নূতন ধাঁচায় তার প্রয়োগ-কৌশল শিখে দেশে ফিরে অকৃতকার্য্য হ'লে, অনেক সময় খেদ্ করেন—এ দেশের মাটিতে সে সব জ্ঞান ফলানো,— সে সব বিদ্যার বীজ ফোটানো সহজ নয়। মাটির অ-গুণ দেখে' তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। কাজ করতে চান যদি তাঁরা নিছক বিদেশী ধাঁচায় তবে ফল ফলানো কঠিন বটে কিন্তু দেশের মাটির গুণাগুণ যাচাই করে, দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মিল খাইয়ে বীজগুলি বপন করলে সফলতার আশা করা যায়। সব কিছু বিদেশ থেকে আমদানী করা

যায়, কিন্তু মাটিটা যে দেশের এ কথা ভুললে চলবে কি করে! চিকিৎসা-বিদ্যাটি খাটাতে হলে' ঔষধ পথ্যের মাত্রা বদল করতে হয় দেশ বিশেষের জলহাওয়ার দিকে নজর রেখে—চিকিৎসকরা জানেন। দেশের ধাত না বুঝে, শক্তি না চিনে, কাজ ফাঁদলে মাটির গুণে কাজ মাটি হবে—ভুল নাই। মরুভূমির তাতা বালিতে সোণার গুড়ো না খুঁজে ফল ফুলের বীজ খুঁজলে নিরাশ হ'তে হবে—কে না জানে। জলে ভেজা নরম মাটিতেই সুন্দর ফলের ও রসাল ফলের গাছ অঙ্কুরিত হয়।

শুধু বিদেশী শিক্ষার বিপত্তি বেশী। আজ দেশ-বিদেশের যোগা-যোগের যুগে পৃথিবীর সকল মানুষকেই দেশ-বিদেশের শিক্ষা ও জ্ঞান সংগ্রহ করতে হচ্ছে—এ দেশের ছেলে মেয়েদেরও সেটি করতে হবে, কিন্তু তার প্রয়োগ শিখতে হবে জলমাটির গুণ বিচার করে। মানুষের জন্মগত বীজটি অঙ্কুরিত হয় নিজের দেশের মাটিতে; তাই দেশের মাটির উপর মানুষের এত টান। দেশে কাজ করতে হলে, মাটি চিনে গুণ বুঝে বীজ ফেললে অ-ফলার ভয় থাকে না কারো মনে। অধিকন্তু নূতন আমদানী বীজগুলি নূতন কায়দায় দেশের মাটিতে ফেলতে পারলে নূতনতর ফল ফলানো বিচিত্র নয়;—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যে।

উৎকৃষ্ট নমুনার মানুষ

প্রাণী-জগতে যেমন নানা জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব দেখা যায় এবং তার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন সেই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নমুনা নয়—দেহের দিক থেকে কোনটি বিকলাঙ্গ, কোনটি আকারে বেঢপ-বেমানান, কোনটি প্রাণধারণের পক্ষে নির্জীব, আবার কোনটি সুস্থ, সবল, সতেজ, সুন্দর। কিন্তু উৎকৃষ্ট নমুনা বলে ধরা যেতে পারে

শ্রেণী বিশেষের মধ্যে তেমন নমুনা একটি খুঁজে পাওয়া যেমন একান্ত দুর্লভ মানুষ জগতেও তাই।

দেড়শ' বছরের কিছু আগে একটি মনুষ্য-সন্তান বাংলাদেশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে পৃথিবীর জন্য কিছু কাজ ক'রে—শত বৎসর আগে দূর বিদেশ গিয়ে শরীর ত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মেই ছিলেন চেতনা-ভরা প্রাণ, সজাগ মন ও স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে। দেশীয় সাধনার অভ্যাসে তাঁর প্রাণ-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে এক সত্যে জাগ্রত হয়েছিল সকল শাস্ত্র গ্রন্থে একের সন্ধান পেয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান দৃষ্টি তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। তাই সাধনমন্ত্র সম্বল করে তিনি সুদুস্তর সাগর পার হয়েছিলেন নির্ভয়ে। জাগ্রত প্রাণ সোণার কাঠি সঙ্গে থাকতো তাঁর সব সময়, যাতে লাগতো ছোঁয়া আলো পড়তো তারই গায়ে, পথ খুলতো সকলখানে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান অবতার নন, অবতার হ'লে বাদ পড়তেন পৃথিবীর সুখ-দুঃখ থেকে। অবতার না হ'লেও কিন্তু তিনি কাজ করেছেন অবতারেরই মত। তিনি প্রেরিত পুরুষ নন কিন্তু কাজগুলি তাঁর এগিয়ে চলেছে প্রেরিত পুরুষদেরই মত প্রেরণার বেগে।

দু' কথায় এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সম্যক পরিচয় দিতে পারে এমন ধীশক্তি-সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই। কথায় তাঁর পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, কাজে তাঁকে চোখ মেলে দেখতে হবে পৃথিবীর গতির পথে। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ধর্ম্ম-বিশ্বাস শত বৎসরে এগিয়ে পড়েছে একের দিকে। নারীর মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করেছে পাষাণচাপা অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে। সভ্যতা নূতন আকার নিচ্ছে নরনারী উভয়ের সম্মিলিত সাহায্যে। ছোট বড় সমান হয়ে একশ্রেণীতে উঠে দাঁড়াচ্ছে নূতন জ্ঞান ও শিক্ষার গুণে। পৃথিবী

মুহুর্মুহুঃ সাড়া দিচ্ছে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সত্য বাণীতে। মানুষ জাতির মধ্যে এই উৎকৃষ্ট নমুনার মানুষটিকে বিস্ময়ের চোখে চেয়ে দেখতে হয় বারম্বার। আজ তাঁর শতবার্ষিক উৎসবের দিনে পৃথিবীর সমগ্র নারী-জাতির তরফ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধার কনকাঞ্জলি অর্পণ করে আমরা কৃতার্থ হচ্ছি।

ছিদ্রান্বেষী প্রতিবেশী

একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত অসুস্থ হন; চিকিৎসক এসে ঔষধের ব্যবস্থা করে' পথ্য দিতে বলে' যান বাৰ্লি। ঘণ্টা দু'তিন পরে পণ্ডিত সুস্থবোধ করলেন অনেকখানি। রোগের গ্লানি তখন কমে গেছে ঢের। নিজের বুদ্ধিতে হাল্কা ঝোল ও নরম অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করলেন পণ্ডিত স্বয়ং। পথ্য প্রস্তুত হয়ে সামনে ধরা, পণ্ডিত ভোজনে বসেছেন মাত্র,—বন্ধুবেশী ছিদ্রান্বেষী প্রতিবেশী দু'জন পণ্ডিত এলেন রোগীর খবর নিতে। অন্নপথ্যের আয়োজন দেখে গুপ্ত হাসি চেপে বল্‌লেন, অন্নপথ্য করছেন, বেশ বেশ, আছেন ভাল তা'হলে—সুখের কথা। উত্তরে শুনলেন, হ্যাঁ, ভাল আছি। পথে বেরিয়ে বন্ধু দু'জন বল্‌তে বল্‌তে চল্‌ছেন, দেখলে পণ্ডিতটি কেমন লোভী! আহার সম্বন্ধে মোটেই সংযম নাই। এই অসুখ, তখনি ভোজন। বাইরে বড় পণ্ডিতী ফলান, ভিতরে ভিন্নমূর্ত্তি। এরই এত খ্যাতি! বাড়ী গিয়ে পণ্ডিত দু'জন খবরের কাগজে খবর পাঠালেন, অমুক পণ্ডিত অসংযত, লোভী, কুপথ্য খান, কুদৃষ্টান্ত দেখান ঘরের ছেলেমেয়েদের। ওঁর কথায় কেউ আস্থা রেখনা বিন্দুমাত্র; কথাগুলো ওঁর ফাঁকা আওয়াজ, সত্য নাই আদৌ।

পণ্ডিতের রোগের খবর সত্য, অন্নপথ্যের আয়োজনও সত্য, চিকিৎসকের আজ্ঞালঙ্ঘন, রোগের মুখে অন্নভোজন চোখে দেখা, মিথ্যা

নাই এর কোনখানে। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল, খ্যাতনামা বিশিষ্ট পণ্ডিতটি অসংযত, লোভী; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করা গেল, আগামী কাল চিকিৎসকের কাছে ভোজনব্যাপার তিনি অস্বীকার করবেন, অতএব মিথ্যাবাদী।

খবরটা ক্রমে বিশিষ্ট পণ্ডিতের কানে এসে পৌছাল, খবরের কাগজের 'কাটিং'টা তাঁর এক বন্ধু খামে পুরে তাঁকে দেখতে পাঠালেন অবিলম্বে। দেখেশুনে পণ্ডিত নিজের মনে বললেন, তাইত'—দেখছি কথাটা সত্য বটে।

দশের বুকে দেবীর আসন

পাঁচটা কথার মিশালে একদিন এক ভদ্রলোক বল্‌লেন, "সহস্রমুখী হিন্দুসমাজকে এক করার জন্য একজন অবতার বিশেষ মানুষ দরকার। হিন্দুরাজা ত নেই, সমাজের মানুষগুলো মুরুব্বি বলে' হঠাৎ মান্‌বে কাকে? রাজা থাক্‌লে যখন যে অদল বদল দরকার হ'ত—বাল-বিধবার বিয়ে দেওয়া, ছোট জাতকে বড় জাতে উঠিয়ে নেওয়া ইত্যাদি হরেক রকমের সমাজসংস্কারগুলো সভা ডাকিয়ে চল্‌ করে' দিতে পার্‌তেন চট করে'; ঘানি ঠেলে চল্‌তে হ'ত না এত দশের মত নিয়ে।"

পাশে বসে' ছিলেন আর এক ভদ্রলোক: তিনি বলে' উঠ্‌লেন—"অবতারের পথ চেয়ে বসে' থাক হাঁ করে'! রাজা খুঁজে মরো মাথা খুঁড়ে'!—কেন? 'দশে মিলে করে কাজ হারে জিতে নাহি লাজ।' দশের বুদ্ধি এক করলে একটি অবতার খাড়া হ'তে পারে। হলেন হিন্দুরাজা, কিন্তু তিনি যদি পুতুল হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে থাকেন কিম্বা বাঘ-ভাল্লুক হ'য়ে দশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন, তেমন অকাল-কুষ্মাণ্ড রাজা নিয়ে সুবিধাটা হবে কার?"

আগের মানুষটি বল্লেন, "কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু শুনছে কে? দশের বুদ্ধি মেলাবে কি করে'? তুমি যাকে বলো সুবুদ্ধি আমি বলি তাকে কুবুদ্ধি। গোল বেধে গেল ঐখানে।"

শেষের মানুষ।—"দশের দিকে চোখ ফেরালে সকল কথাই সোজা হয়। নিজের ইষ্ট ভেবে মরছি দিনরাত ঘরের কোণে নিজের মনে।

'ছটাক তেলে আলোক জ্বেলে।
পথ দেখি ঐ দুচোখ মেলে॥
দশের দিকে চোখ ফেরালো।
পড়্‌ল পথে দিনের আলো॥'

জানো না, চণ্ডীতে লেখা আছে, যুদ্ধে দেবতারা হেরে হেরে হয়রাণ। বুদ্ধি জোগাল—দশে মেল্‌বার। নিজের নিজের সারবুদ্ধি সংগ্রহ ক'রে তাঁরা মিলিয়ে ফেল্‌লেন যেই এক করে', অমনি হ'ল চণ্ডীর আবির্ভাব।

'দশের বুকে দেবীর আসন।
পর কোথা ভাই,—সবাই আপন।—'"

দৈব সম্পাদ

যে দেশের সকল মানুষ খেটে খাওয়ার সুযোগ পায়—বেকার ব'সে থাকে না, যে জাতির একটি মানুষ একদিনও ভগবানের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত সেই দেশ ও জাতি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কর্‌বে একথা নিঃসন্দেহ সত্য। অসংখ্য বেকার-বিড়ম্বিত যে দেশ ও যে জাতির অধিকাংশ মানুষ অনাহারে মৃতপ্রায়—বাঁচ্‌বার চেষ্টায় তারা যখন প্রাণপণ উদ্যোগ সুরু করে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দুনিয়ার খোলা রাস্তায়, পায়ে হেঁটে চল্‌তে থাকে পৃথিবীর অফুরাণ পথ ধরে, ঐশ্বরিক নিয়মে তারা তখন নূতনতর কাজের প্রেরণা লাভ করে নিজের মধ্যে— পৃথিবীতে তাদের নূতন জন্ম হয় দৈবপ্রসাদে।

হাওয়ার ভরে আস্‌বে নেমে নূতন কাজের প্রাণ,
আলস্য আর অক্ষমতার ঘটবে অবসান।
প্রাণের দায়ে পড়্‌বে যখন কাজের ঘরে হাত,
সফল শ্রমে জাতির জীবন জাগবে অচিরাৎ।

প্রশ্নের দায়

যেখানে যাই প্রশ্নের দায়ে ঠেকি।
ছেলেবুড়ো সকলের মুখে এক প্রশ্ন—
"নিজের কাজ না করে' অন্যের কাজ কর কেন ?"
তারা বোঝে না যে, কাজের বোঝাটুকু তা'হলে অন্যে বয় ;
শুধু কাজ করার আনন্দটুকু থাকে নিজের জন্য।

আরো খোলসা প্রশ্ন—

"নিজের উদ্ভাবিত কোন একটি নূতনতর নামের কাজ না ফেঁদে
পরের নামের তল্পি বয়ে বেড়াও কেন ?"
তারা জানে না, নামের দায়টি বড় বিষম দায় ;
একবার তাতে মাথা দিলে রক্ষা নাই কারো ;
নামটিই ক্রমে বড় হয়ে উঠে'
মানুষকে চেপে ফেলে আগাগোড়া।
তখন নাম ছেড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার যো থাকে না আদৌ ;
শেষে নামের দায়ে মানুষকে আত্মহত্যা করতে হয় পলে পলে।

দেখছো না, বড় বড় সম্প্রদায়

নামের দায়ে পৃথিবীকে আজ বিপাকে ঠেকিয়েছে কতখানি !
ধর্ম্মের ধরণটাই হয়েছে বড়ো ধারণার চেয়ে।
ধরণের তলায় ধারণাটা গেল লুকিয়ে,
মানুষগুলো চাপা পড়লো তারও তলায়

'মানুষ' নামটা বড় করে তুলে'
বাকি নামগুলো নীচের কোঠায় ফেললে কেমন হয়—
হোক না সে যে ঘরের—যে দলের —যে জাতের—যে সম্প্রদায়ের।

কাজের প্রশ্ন

কাজের উপর কোন একটা নামের মার্কা বসালে পৃথিবীর কাজের খাঁটি প্রেরণাটুকু বন্ধ হয়ে যায়—আমার ধারণা।

—অমুকের কাজ করেন কেন, তাঁরা কি আপনার নিজের কেউ হন ?
আর সকলের কাজ ছেড়ে তাঁদের কাজটাই করার কারণ কি ?
—না, কেউ হন না, তাঁদের কাজটা মেয়েদের কাজ,
মেয়েদিকে স্বস্থানেই সুপ্রতিষ্ঠ করাই সে কাজের লক্ষ্য ;
যাতে দশটা মেয়ের সুখ-সুবিধা,
তেমন কাজে ডাকলে যেতে প্রস্তুত সর্ব্বদা সকল খানে।
তাঁরা ডেকে নিয়ে গিয়ে সোজা বসিয়ে দিলেন মেয়েদের কাজে,
সেই থেকে জুড়ে গেছি ঐ কাজের মধ্যে ; যা পারি তাই করছি মাত্র।
ডাকের মধ্যে বাঁকা-চোরা ছিল না কিছু তাই বাধেনি কোনখানে।
আরো যে-কেউ ডাকে,—যে কেউ বলে,
তাঁদেরও কাজ করে' দিতে চাই যতটুকু পারি,
যদি সেটা মেয়েদের কাজ হয়।
—ছেলে মেয়ে দুই সমান ;—উভয়ের কাজে না গিয়ে
একদলের কাজে জোড়া থাকেন কেন ?
—কাজের অসংখ্য ধারা—
একটা ধারা ধরে' ত' কাজ সুরু করতে হ'বে।
ভালোটা কোনো একদিক থেকে ঘটতে সুরু হলে
সব দিকে গিয়ে পৌছায়—রস যোগায় সকলখানে।

আলো জ্বালা

বাংলার পল্লীবধূরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে প্রদীপের আলোক একবার দেখিয়ে আনেন, অন্ধকার এসে পৃথিবীকে ঢেকে দেওয়ার সঙ্গে কোন হিংস্র জন্তু, দুষ্ট মানুষ, বা চোরডাকাত ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে কি না দেখবার জন্য।

গৃহস্থের মঙ্গলকর এই আলো-জ্বালা প্রথাটি নিতান্ত ক্ষণিকের ব্যাপার নয়। সভ্যতার আদি-জননী অগ্নিকে ব্যবহার করতে শেখার সঙ্গে মানুষ আলো জ্বালতে শিখেছে, সেই থেকে অদ্যাবধি সে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার ঘর আলো করে' আসছে।

মানুষের প্রথম শুভকর, আদিম সভ্যতার অগ্নি-উৎপাদক ক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করে' স্মৃতিতে ধরে' রাখবার জন্যই বাংলায় দীপালোকে সন্ধ্যার্চ্চনা প্রথার প্রচলন। প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানর সঙ্গে বাংলার গৃহস্থবধূরা শঙ্খধ্বনি করে' গৃহস্থের মঙ্গল ঘোষণা করেন—সকলকে জানান, আমরা আলো জেলেছি, অন্ধকার হতে আমাদের অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

সুন্দর সন্ধ্যায় এহেন সুন্দর প্রথায় সন্ধ্যাদীপের আলোক যখন ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে, তখন তার মৃদু উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয় কে,—তাকে ভাল না লাগে কার? আর দীপহস্তে গৃহস্থবধূর কল্যাণীমূর্ত্তি গৃহস্থের কল্যাণ ছাড়া আর কি কামনা করতে পারে!

মন দিয়ে না দেখতে শিখলে সত্যের ধারণা করতে, প্রয়োজন হিসাবে তার মূল্য দিতে, ও সুন্দর জেনে' তাতে প্রীতি বসাতে মানুষ পারে না। তাই মানুষের দিক থেকে মনের চোখ খোলাই সকলের আগে দরকার।

দিন যেমন চিরন্তন, সন্ধ্যাও যখন তেমনি চিরন্তন, এবং রাত্রিও যখন তাই, তখন আবছা-ঢাকা ঝাপসা সন্ধ্যায় দীপালোক জেলে' অন্ধকারের

অবশ্য দিনের বিশ্বজোড়া স্বপ্রকাশ উজ্জ্বল আলোক মুর্ত্তির কাছে দীপের মৃদু সুন্দর ক্ষীণ আলোকশিখার অপ্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করে' থাকেন; কিন্তু দিন অবসানে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পরিণামে রাত্রি, রাত্রি অবসানে উষার উদয় এবং তার পরিণামে উজ্জ্বল দিন যখন অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গাঁথা সত্যের চিরন্তন ধারা, তখন তার প্রত্যেক আবির্ভাবকে অস্বীকার করবে কে?

মানুষের চিন্তা ও চেষ্টার সীমা ছাড়িয়ে দিনের আলোক যখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে—তার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ যখন সচেতন, প্রাণবান ও কর্ম্মচঞ্চল হয়ে জেগে ওঠে তখন কোথা থেকে কেমন করে' সে আসে জানে না বলে মানুষ তাকে দৈবদান বা দেবপ্রসাদ বলে' গ্রহণ করে। এর মাহাত্ম্য খুব বেশী হলেও—এর প্রভায় প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবী ও মানুষ অধিকতর উজ্জ্বল, সুন্দর ও নূতন হয়ে উঠলেও নিজের চেষ্টায় জ্বালানো দীপালোকের ছটাতেও মানুষকে কম সুন্দর দেখায় না। অসংখ্য দীপের অসংখ্য আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পড়ে প্রতি সন্ধ্যায় পৃথিবীকে কম সুন্দর করে তুলে না। অতএব মানুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই আলোজ্বালা ব্যাপারটিকে মানুষ যদি দরদ দিয়ে চিরন্তন ও চিরসুন্দর আখ্যা দেয়—দিব্য আলোকধারার সঙ্গে যদি তাকে সমান করে'ই দেখে, তবে সে এমন কি অপরাধ করে? আলোক জিনিষটি নিজে ত চিরন্তন, মানুষের হাতে জ্বলল বলেই কি তার দর কমে যাবে?

মানুষ না থাকলেও পৃথিবী থাকতে পারে—পৃথিবীতে উষা,—সন্ধ্যা, আলোক-অন্ধকারের আবির্ভাবও যথানিয়মে ঘটতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে সন্ধ্যায় পৃথিবীকে সুন্দর করে' তোলার জন্য দীপ জ্বালাতে তখন আর কেউ থাকবে না। তার অভাবে সন্ধ্যা ম্লান ও সৃষ্টি হয়ত তাৎপর্য্যশূন্য হয়ে উঠবে, মনে হয়।

মানুষের মন জানা, না-জানায় ঘেরা ; তাই ঝাপ্সা আলোয় তার কাজ চলে ভালো। তার প্রথম কীর্ত্তিটি তাই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যার নির্জ্জন কোলে অর্জ্জন করা। বৈজ্ঞানিক যুগে প্রখর বৈদ্যুতিক আলোর দীপ্তিতে বসে গোড়াকার সেই আলো-জ্বালা কীর্ত্তিটির কথা হয়ত আমরা ভুলে গেছি ঃ কিন্তু কল্যাণী পল্লীবধূ তাঁর কল্যাণ হস্তে আজও তার স্মৃতিচিহ্নটুকু বহন করছেন—নিজের হাতে আলো জ্বালিয়ে আঁধার ঘর আলো করে।

ঘরের বধূ নয়কো শুধু
ঘর সাজান রূপের ডালা,—
নিত্য কাজের অঙ্গটি তার
আঁধার ঘরে আলোজ্বালা।

অন্ধকার যখনি যেথায় এসে ঢাক্‌বে তখনি মানুষকে সেথায় আলো জ্বালতে হবে। আলোজ্বালা কাজটি তাই মানুষের অফুরন্ত।

ঘরের বুকে আলোক জ্বেলো—
যেথায় যত কলুষ-ক্ষত
দু'হাত দিয়ে দূরে ফেলো!

গহনার আদর

মেয়েরা সাধারণতঃ গহনা পর্‌তে ভালোবাসে। সুন্দর নমুনার সুদৃশ্য গহনাগুলি তাঁদের অঙ্গে মানায়ও বেশ। গরীব গৃহস্থ ঘরেও নূতন বৌ ঘরে এলে গায়ে দু'চারখানা সোনার গহনা থাক্‌লে দেখায় ভালো লোকসমাজে—বৌকেও সুশ্রী করে' তুলে গহনার গুণে। গিন্নীর হাতেও সোনার কাঁকণ সধবার সুলক্ষণটি প্রকাশ করে সুন্দর ভাবে।

কাজের দিক থেকে মেয়েদের গায়ের গহনারূপী এই সোনাটুকু গৃহস্থের সম্পত্তিও বটে। বিপদে আপদে বন্ধক দাও, বিক্রী কর, তৎক্ষণাৎ কিছু পাওয়া যায়। দায়ে ঠেক্‌লে সেটি কম সাহায্য নয়।

গৃহস্থ-ঘরের লোকদি'কে প্রায়ই গহনা বন্ধক দিতে দেখা যায়। সুদে আসলে টাকা সময়ে সময়ে এত বেড়ে উঠে যে অনেকে সে গহনা আর ছাড়িয়ে আনতে পারে না। গহনা-বন্ধকের কারবার করে অনেক ধনী লোকেও। সহজে কেউ এক পয়সা সুদ ছাড়্‌তে চায় না। ফলে গহনাগুলি বিকিয়ে যায় সুদের দায়ে।

আমাদের প্রস্তাব,—স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি যদি গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন ও সামান্য সুদ নেন, তবে গরীব গৃহস্থের যথেষ্ট উপকার হয়। কায়ক্লেশে সুদটি মাসে মাসে দিয়ে যেতে পার্‌লে কোন এক সময় আসল টাকা চুকিয়ে দিয়ে গহনা ক'খানি ফিরিয়ে আনার আশা থাকে। ঘরের বৌ-মেয়েরাও তাদের অনেক সাধের গহনাগুলি ফিরে পেয়ে সুখী হয়।

দেশের বড় বড় প্রয়োজনের কথা বড় বড় চিন্তাশীল লোকেরা ভাবেন ও বলে' থাকেন। সে সব কথার মূল্য খুব বেশী,—সকলেই সে কথা কান পেতে শোনে। কিন্তু ছোট ছোট প্রয়োজনীয় কথাগুলিরও আলোচনার দরকার আছে। সাধারণ বুদ্ধির ও অবস্থার মানুষ দেশে হাজার হাজার। সহজে তাদের জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা না হ'লে ঠেলেঠুলে তারা মাথা তুলতে পারে না কোন দিনও। তাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট অভাব-অসুবিধাগুলি দূর কর্‌তে পার্‌লেও দেশের অনেকখানি কাজ করা হয়। কারণ, সংখ্যায় দেশের মধ্যে তারাই খুব বেশী। এর জন্য সাধারণ ব্যবস্থার দরকার।

"হাজার মানুষ ছোট্ট কথাই কয়,—
ছোট্ট দরের দুঃখ তারা
অনেকটুকুই সয়।"

গরীব গৃহস্থ ভদ্রলোকদি'কে স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতায় মজবুত করে' তুলতে না পারলে দেশ সহজে এগোতে পারবে না, আমাদের স্থির ধারণা। তাই নিজের নিজের পরিধির মধ্যে সকল মানুষকে সুখী ও সুন্দর হ'য়ে ওঠার জন্য আমরা আগ্রহ জানাচ্ছি।

স্ত্রীধনের পরিণাম

সকলেই জানেন ও বলে' থাকেন, স্ত্রীধন মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি। তা থেকে মেয়েদি'কে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না—দেশের আইন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা—যাদের স্ত্রীধন গায়ের সামান্য ক'খানি গহনা মাত্র—বিধবা হ'লে কি ভাবে যে তারা সেই সৎসামান্য গহনা ক'খানি থেকে ফাঁকি পড়ে, কেউ তার খবর রাখেন কি?

জানেন ও দেখেন অনেকেই, কিন্তু কাগজে কলমে এবং লোকমুখে তার অন্দোলন শোনা যায় না আদৌ। অর্থাভাবে বিধবারা মরে মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্তে, দাসীত্ব স্বীকার করে পদে পদে,—তাদের শেষ সম্বল স্ত্রীধনরূপী গায়ের গহনাগুলি বিঘোরে খোয়া যায় লোকচক্রে পড়ে'—দুটো কথা বলার কেউ থাকে না।

গরীব ভদ্রলোক দেশে খুব বেশী। বিধবা নিয়ে কারবার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভদ্র গরীব ঘরের প্রায় প্রত্যেক বিধবাই স্ত্রীধনে বঞ্চিত। বলতে গিয়ে তারা চোখের জল ফেলে, কিন্তু সে জলে দেশের মাটি ভিজে না এতটুকু—জল গড়াতে পায় না মাটি পর্য্যন্ত বলে'। অতি-হিতৈষী আত্মীয়েরা বিধবার চোখের সেই গুপ্ত জলটুকু গাপ

করে' ফেলেন গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে। সব গেল,—কথাটি কওয়ার জো নাই। ধনী-ঘরে এমনতরটি ঘটে কম; কারণ, তাদের মামলা করার টাকা থাকে এবং পৃষ্ঠপোষক লোক পায় তারা টাকার জোরে। বিপদ যত মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরে। বিধবা হওয়া মাত্র সেই যে তারা গায়ের গহনা খোলে আর সে গহনা হাতে ফিরে পায় না কোনদিন। তাদের ঠকানো, তাড়ানো সবই সহজ সকলের পক্ষে। দেওর ভাসুর তাড়ান, শ্বশুর শাশুড়ী তাড়ান;—গহনা চাইতে যাও,—অগ্নিমূর্ত্তি! সহায় তখন বাপ ভাই। তাঁরা সাহস পান না শ্বশুর ভাসুরকে জোর দেখাতে বা তাঁদের সঙ্গে মামলা করতে। তিনশো টাকার জিনিষ আদায় করতে চারশো টাকা মামলা-খরচ! ফলে বিধবা বঞ্চিত হয় স্ত্রীধনে। অপব্যয়ী অবিবেচক বাপ-ভাইয়ের হাতেও স্ত্রীধন মারা পড়তে দেখা গেছে সময়ে সময়ে।

স্ত্রীর অন্নাভাবের দুর্গতি কেউ যদি না দেখ্‌তে চান, তবে সে একমাত্র স্বামী।—

"স্বামীর সমান বন্ধু ত্রিজগতে নাই।
দুঃখ যদি দেন তবু রক্ষক সদাই॥"

স্বামীরা এ সম্বন্ধে এখন সচেতন হোন্‌,—সতর্ক হোন্‌। নিজের গরীব সংসারে কোন একটি অর্থকরী বিদ্যা জানা মেয়ে ছাড়া বিয়ে করে' আন্‌বেন না, দৃঢ় পণ রাখুন নিজের মনে। দুশ' টাকা পণ না নিয়ে শিল্প বিভাগের সার্টিফিকেট পাওয়া মেয়ে দেখে নিন বিশেষ করে। ঘরে এনে নূতন বৌয়ের বিদ্যেটুকু কাজে লাগান দৈনিক। বাজারে তার হাতের শিল্প বেচে' যা পারেন দু'চার টাকা সংগ্রহ করে' আনুন। সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি জমা দিন বৌয়ের নামে। বাপ-মায়েরা এ বিষয়ে উৎসাহ দিন ছেলেকে নিরুৎসাহ না করে'। মা-বাপ থাক্‌তে

ছেলে যদি স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবেন, তবে অবুদ্ধি বাপ-মা মনে করেন, ছেলে আমার পর হ'য়েছে—পরের মেয়ে ঘরে এসে ঘরের ছেলেকে পর করেছে। সুবুদ্ধি বাপ-মা বিবাহিত ছেলেকে স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবতে শেখান, জড়িয়ে রাখার জটিল বুদ্ধি ত্যাগ করে' সকলকে স্বাধীন হতে শিক্ষা দেন গোড়া থেকে,—ফলে স্বরাজ আসে ঘরের মধ্যে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যিনি ঐক্য বেঁধে তুলতে পারেন, সমাজ ও জাতি-গঠনে তিনিই শ্রেষ্ঠ কারিগর। অন্য কথায়, তিনিই সত্যকার মানুষ। দেশের সব লোক মানুষ হোন্, শোকের জলে ধোওয়া বিধবার স্ত্রীধনগুলি ফিরিয়ে দিন তাদের হাতে ধর্ম্ম ভেবে'। এবং, স্ত্রীধনের পরিণাম দেখে গৃহস্থ বাপ-মা ছোট থেকে কুমারী মেয়েকে, ও স্বামী নিজের বয়স্থা স্ত্রীকে এমন একটি ধন দিতে চেষ্টা করুন,—

"যে ধন কখনো কেহ কাড়িতে না পারে।
সাথে থাকি' সদা রক্ষা করে আপনারে॥"

গৃহস্থ ঘরের প্রত্যেক মেয়ের অর্থকরী বিদ্যা শেখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীরও কর্ত্তব্য স্ত্রীর কিছু সম্বল করে' দেওয়া প্রথম থেকে। উভয় দিকে বলটুকু থাক্‌লে অসমর্থ মেয়েরা বিপন্ন হ'য়ে পড়বে না অত বেশী।

একজন ভদ্র ইংরাজকে বল্‌তে শুনেছিলুম, "বিবাহের দিন স্ত্রীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে তবে বিবাহ করব। যেমন করে' পারি বিবাহের পূর্ব্বে ঐ টাকা সংগ্রহ করে' আন্‌বো। নিজের স্ত্রীকে নিঃসম্বল রাখা মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমাদের জাতের লোকেরা অপরাধ মনে করে।"

এ দেশে মেয়েদের আশা বেশী নয়। ভদ্র গরীবের ঘরে নগদে গহনায় এক হাজার, ও মধ্যবিত্ত ঘরে তিন হাজার সম্বল থাক্‌লে বৈধব্যে

মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। পুরুষ অভিভাবকদের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মানুষের একজোট হওয়া

মানুষ সহজে একজোট হ'তে পারে না—নিজের ইচ্ছামত চলার দিকেই তার ঝোঁক;—পিঁপ্ড়েরা যেমন সার গেঁথে একজোট হ'য়ে চলে, কাউকে শেখাতে হয় না, বলতে হয় না, সারে সারে তারা চল্‌তেই থাকে নিজের মনে, মানুষ ঠিক তেমনটি পারে না। একসঙ্গে পা ফেলতে হাত তুলতে সৈন্যদের কতবার অভ্যাস করাতে হয়,—স্কুলের ছেলেদের সার হ'য়ে সোজাভাবে দাঁড় করাতে শিক্ষকদের কতবার ধমক দিতে ও সাবধান কর্‌তে হয়, কে না দেখেছে। কলে ফেলে চাকায় চলা মানুষের মনের কাজ নয়, তাই ঐ ভাবে চালাতে গেলে থেকে থেকে মানুষ বিগ্‌ড়ে দাঁড়ায়, ছিট্‌কে পড়ে নিজের মতে। মানুষের সোজা পথটা তবে কি?—ইচ্ছামত চলা। ইচ্ছামত চল্‌তে পেলেই, সে সোজা পথটা খুঁজে পায় নিজের বুদ্ধিবলে সহজে।

কত নূতনতর আশ্চর্যাতর জ্ঞান মানুষ তুলে ধরেছে পৃথিবীর সাম্‌নে, নিজের ইচ্ছামত চলারই গুণে। নূতন কোন কিছু পৃথিবীতে আসতে পারে না মানুষ যদি না নিজের ইচ্ছামত চলে। তবে কি মানুষ কোনদিন কোনদিক্ থেকে একজোট হ'তে পার্‌বে না, স্বতন্ত্রই থেকে যাবে চিরকাল?—দেখা যাক আলোচনা করে'।

ধর্ম্মরাজ্যে কতক মানুষ কয়েকবার একজোট হয়েছে, দেখা গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। বুদ্ধের অতিমানবীয় পরম সাধনায় নির্ব্বাণ বা শাশ্বত শান্তির স্বাদ পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে। বহু মানুষ তার মধ্যে ডুবে যাবার জন্য একজোট হ'য়ে একপথে চলেছে বহুকাল ধরে'। কিন্তু

পৃথিবীকে বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে সে সাধনায় ; তাই পৃথিবীর মোটাদরের মানুষ তার নাগাল পায় না সহজে। সাধনা চলুক,—যিনি পারেন সে পথ ধরুন, আয়ত্ত করুন সেই পরম সিদ্ধি,—জ্বলুক্ পৃথিবীর কপালে সেই অনির্ব্বাণ আলোক জ্বল্ জ্বল্ করে'। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষগুলো যায় কোথায় পৃথিবী ছেড়ে?—পৃথিবীর জলমাটিই তাদের সর্ব্বস্ব, শস্য-ফসলই প্রাণ, পৃথিবীতে খেয়ে-বসেই তাদের সুখ,—পৃথিবীর ভালোবাসাই তাদের স্বর্গ,—পৃথিবীকে সুন্দর করে' তুলে', সুখী হবার সহজ পথ তাই খোঁজে তারা সব সময়। পৃথিবীর ভালোতে নিজের ভালো, কথাটা বোঝে সহজে।

এল খৃষ্টের নির্ম্মল নিষ্কলুষ সুকুমার মাধুর্য্যময় প্রেমের পরিত্রাণ পৃথিবীর বুকে,—হাজার মানুষ জড়ো হ'ল তার তলায়। যে কেউ সে প্রেমকে স্বীকার করে' নিজের মধ্যে আনতে পারে, সে সুখী হয় চিরদিনের মত—ত্রাণ পায় অচিরাৎ। কিন্তু খৃষ্টের মত নির্ম্মল হওয়া সহজ ব্যাপার নয় সাধারণের পক্ষে। ফোটে যদি মানবাত্মা তত সুন্দর হ'য়ে, আসে যদি খৃষ্টের মানবপ্রেম খৃষ্টান-অখৃষ্টান সকলের অধিকারে, তবেই মানুষ ইচ্ছামত তাকে গ্রহণ করে' ধন্য হবে পৃথিবীর পথে।

এল পৃথিবীতে মহম্মদের মহান্ বাণী—অপ্রতিদ্বন্দী এক-সত্য আল্লার সুমহৎ নাম—ভারতীয় ওঙ্কারের মত পৃথিবীর আকাশ মহারবে ঝঙ্কৃত করে',—ঠেক্‌ল গিয়ে ঈশের মূল সাপের মাথায়। আল্লার আলোকময় নাম বশ কর্‌ল দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতিকে,—জড়ো কর্‌ল তাদের এক নিশানের তলায় এনে,—ছড়িয়ে পড়্‌ল নূতন আলোক মানুষগুলির গায়ে। অনির্ব্বচনীয় অননুকরণীয় বিশুদ্ধ আল্লার নাম স্মরণে ও ভাব অনুকরণে ভাব্‌তে শিখল তারা, অবিভক্ত এক-সত্য আল্লার নামে সকল মানুষ সমান হবে একদিন এ পৃথিবীতে সুন্দর হ'য়ে। মুসলমান ভক্তসাধক, কবি

ও জ্ঞানী সুফীগণ অনেকে পৃথিবীর ঐ সুন্দর ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখেও ছিলেন অনেকবার।

এল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অননুভূত অপূর্ব্ব অনুপম অমৃতময় ভক্তি-রসধারা,—পৃথিবীর যত ধূলা মুছে গেল মুহূর্ত্তে, জীব কৃতার্থ হ'ল তার আস্বাদ পেয়ে ;—

নামে রুচি জীবে দয়া হইল প্রচার।
অভিষিক্ত করি' দিল বক্ষ বসুধার॥
উচ্চারেন মহাপ্রভু হরিনাম ধ্বনি।
হরি হরি বলি' মুখে পড়িল ধরণী॥

মানুষ দেখে অবাক, শুনে অবাক, পেয়ে অবাক, সেই অপূর্ব্ব রসের অভূতপূর্ব্ব পরিচয়। পৃথিবী ধরে রাখ্‌তে পারে না সে রস সারাক্ষণ নিজের মধ্যে, তাই পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে—মানুষ বিকৃত হয়ে পড়ে রস-সাধনায় অনেক সময়।

এল ভক্ত কবীরের অমূল্য ভক্তিবাণী—চিরন্তন সত্যকে প্রতি কথায় প্রতিপাদন কর্‌তে।

এল গুরু নানকের অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ "গ্রন্থ সাহেব" নিরাকারের নব বাণী,—নির্ভীক শিখজাতি গড়ে উঠ্‌ল যার নব প্রেরণায়, অসম সাহসে অলক্ষ্যের লক্ষ্য নিয়ে।

এল রাজা রামমোহনের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বুদ্ধির উপলব্ধি—এক সত্যের স্বাধীন জ্ঞান, স্বাধীন জ্ঞানের স্বাধীন কাজ ; ধরা পড়ে গেল মানুষ জাতির গোড়ার মিলটি আশ্চর্য্যভাবে। মানুষের ধর্ম্মের গোড়ায় মিল, কর্ম্মের গোড়ায় মিল, জ্ঞানের গোড়ায় মিল, ভাবেরও গোড়ায় মিল—এক কথায় মানুষ জাতটি আসলে এক ; রাজা রামমোহন এই কথাটি ধরে' দিলেন সকল মানুষের চোখের সাম্‌নে, দিনের আলোতে।

কথাটা উঠ্‌ছিল খুঁইয়ে খুঁইয়ে পৃথিবীর চারিপাশে, জ্ঞানী, ধ্যানী, সাধু, সাধক আভাস দিচ্ছিলেন তার থেকে থেকে। রামমোহনের প্রজ্ঞার আলোকে সেটি আগুন হয়ে জ্বলে উঠ্‌ল দপ্‌ করে। দিনের আলোয় পথ দেখা গেল স্পষ্ট ভাবে, ভেঙে গেল ঠেলাঠেলি, ঠাসাঠাসি, চাপাচাপির চাপ—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়তে সুরু কর্‌ল মানুষের দল একজোটে। সকল ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা সুরু হ'ল পৃথিবী জুড়ে আগু পিছু করে। এল দেশে রামমোহনের স্বাধীন বুদ্ধির স্বাধীন কাজ—সর্ব্বোন্নতিবাদ বা উন্নতিসমন্বয়। কালক্রমে বিকৃত, প্রচলিত দেশীয় আচার অনুষ্ঠানের রাশীকৃত জঞ্জাল দূরীভূত হয়ে সুরু হ'ল সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, জ্ঞান, কর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সবের উন্নতি, এবং সকল উন্নতির পরাকাষ্ঠা এ দেশে নারী-উন্নতি। একজোটে সমভাবে আলো পড়ল ছোট বড় পুরুষ নারী সবার চোখে—দেখ্‌লে সবাই, লোক জোটানো কাজ নয় তার চোখ ফোটানই কাজ—

সার গেঁথে কেউ চল্‌বে না আর
চলার পথে—
দিনের আলো পথ দেখাবে,
চলবে মানুষ ইচ্ছামতে।

পৃথিবীর কাজ এগিয়ে চলেছে হু হু করে—মানুষের জ্ঞান বেড়ে উঠ্‌ছে প্রতিমুহূর্ত্তে—সকল জাতি সম্প্রদায়ে স্বাধীন বুদ্ধির মানুষ জন্মাচ্ছেন অসংখ্য। সকলের বুদ্ধি স্বাধীন করে তুলে, মানবজ্ঞানে এক সত্যের মিল ঘটিয়ে, পৃথিবী আশ্চর্য্য আনন্দের মধ্যে নিজেকে সফল করে তুল্‌তে চাইছে একান্ত চেষ্টায় ;—তারি আয়োজন আগাগোড়া।

সমস্ত পৃথিবী স্বাধীন হবে সর্ব্বতোভাবে, সকল মানুষ সমান অধিকার

পাবে পৃথিবীর বিচিত্র কাজে, পৃথিবীর দিক্‌খোলা পথে ইচ্ছামত চলে' নরনারী সুখী হবে সকল দিক থেকে। এই ঐশ্বরিক প্রেরণার গতি রোধ করবে কে?—

একই সুরে সবাই বাঁধা
জানি বা আর না-ই জানি,
একই তারে সবাই বাঁধা
মানি বা আর না-ই মানি।
একই কথা সবাই বলি
ভাষা যতই হোক্‌নাকো,
এক রাগিণী সবাই ভাঁজি
সুরের তফাৎ থাক্ নাকো।
একই মরণ সবাই মরি
মর্‌তে চাই আর নাই বা চাই,
একই জনম সবাই ধরি
ধর্‌তে চাই আর না-ই বা চাই।
এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক তাঁতে,
দশার ফেরে যতই ফিরি
আগু পাছু এক সাথে।
একই ধরম, একই করম
একেরই সব কারখানা,
এক ছাড়া তুই বল্‌ব যারে
কই, কোথা তার নিশানা!

প্রেরণার বেগ

পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ প্রেরণার বেগে ছুটে চলেছে,—থামানো যাবে না তা' দি'কে আজ কোন উপায়ে। প্রেরণা এক ধরণের নয়; তার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে নানা ভাবের। অনুকরণ অনুসরণে সাম্‌লে চলার ভাবটি লুকোতে গেলেও ধরা পড়ে। প্রেরণার বেগটি তা থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ। সে ঝড়-বাদল মানে না, কাঁটা-খোঁচায় ডরে না,—ঠেলার বেগে এগিয়ে চলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। মানুষ তার বশে চলে;—বশ মানাতে পারে না তাকে নিজের কোঠায় এনে। একেই বলে ঐশ্বরিক শক্তির বেগ বা প্রেরণা। 'খোদার উপর খোদ্‌গিরি' অর্থাৎ নিজের বাহাদুরি চল্‌বে না এর গতির মুখে। ভবিষ্যৎ দেখা যায় না চোখের গোড়ায়, তবু অদৃশ্য লোক থেকে চোখে যেন আলো এসে পড়ে এর চলার পথে। পৃথিবীর নূতন ভবিষ্যতের আভাস এসে পড়েছে মানুষ-রাজ্যে;—তারই আশায় ছুটেছে মানুষ ঊর্দ্ধ মুখে,—নূতন হবে, নূতন করে' তুল্‌বে সবকিছুকে। কে জানে সে কেমনতর ভবিষ্যৎ! অনুমানে আভাষ দেয়, যেন জড়-চেতনে জড়ানো মানুষ জড়স্তরের মাত্রা ছাড়িয়ে কতকটা চেতন-স্তরে উঠে পড়বে সুন্দরতর হ'য়ে। তার গতি হবে স্বচ্ছন্দ, কাজ হবে অপর্য্যাপ্ত অথচ সহজ। জড়রাজ্য ভেদ করে' যাবার সময় কতকটা কষ্ট ত হবেই; সকলকে তার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এদেশের ভাগ্যে যে ঐক্যের প্রেরণা নেমেছে, তার রূপটি চোখে দেখতে ও রসটি ভোগ কর্‌তে হবে ষোল আনা এদেশের সবাইকে—বাঁচো মরো যে পথ ধরে' যেমন খুসী। বিধাতা কাজ হাসিল করে' নেবেন নিজের পছন্দে।

মানব-ঐক্যের বর্ত্তমান রূপ

সকল মানুষকে সমান করে' তুল্‌তে ও সমান অধিকার দিতে বহুবার

বহু মহাপুরুষ চেষ্টা করে' গেছেন বহু প্রকারে। তাঁদের ছড়ানো বীজ পৃথিবীতে অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ করেছে বহু-দিন থেকে। দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে দুঃসহ তপঃক্লেশ সম্বল করে', দেশ-বিদেশে মানব ঐক্যের বাণী প্রচার করতে তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। আজ এই মানব-ঐক্যের শ্রেষ্ঠতম যুগে তাঁরা একান্তভাবে স্মরণীয়। প্রত্যেক মানুষ নিজের বুকে সেই মহাপুরুষদের চরণধ্বনি শুনতে পাবে ক্ষণকাল স্থিরভাবে মন দিলেই। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ রেলরোড, টেলিগ্রাফ, ডাকবিভাগ, ছাপাখানা—আরও শত সহস্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-উদ্ভূত কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে মানব-ঐক্যের সেই বড় কথাটি ছোট বড় সকলের দ্বারে এসে পৌঁছেছে সহজে,—এক মুহূর্ত্তে এক যুগের কাজ সাধন ক'রে তুলছে মানবজাতির সৌভাগ্যের খবর নিয়ে। সে আজ ধনী-দরিদ্রকে সমান করবে, নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করে' তুলবে,—বাধা ভাঙবে সকল মানুষের, সব দিকের উন্নতি-পথের। এ সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর লোকরাই কি পড়ে' থাকবে ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে। হিন্দুর উচ্চবর্ণের লোকদের এতে ভয়ের কি আছে? তাঁদের সদভ্যাস, সুরুচি, শুচিতা, বিদ্যাচর্চ্চা, উঁচুদরের ব্যাবসাদির—ওকালতি, ডাক্তারি—ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যদি নিম্নবর্ণের লোকেরা সেগুলি আয়ত্ত করে, তবে নিম্নবর্ণের সেই উন্নতিটি জাতির মহা সম্পদে পরিণত হবে। এ থেকে জাতিকে বঞ্চিত করবে, এমন নির্ব্বোধ কে আছে? বহু শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ছিঁড়তে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের অনেকের প্রাণে বাজছে—শুনতেও পাচ্ছি, দেখছিও। তাঁদের কাছে এই নিবেদন, মায়ের হৃদয় পেতে এই সকল অনুন্নত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের তাঁরা নিজের বুকে ধারণ করুন। এরা তাঁদের সংস্কার-ছেঁড়া ধন হ'য়ে দেশের বুকে জেগে থাকবে।

সমাজ-বিপ্লব

মানুষ জাতটির মধ্যে বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে' থাকেন কতকগুলি মানুষ প্রায়ই। নিজের স্বাভাবিক পাওয়া শক্তিটির চর্চ্চা করে ধীরে ধীরে তাঁরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে অসাধারণ স্তরে উঠে পড়েন। আশপাশের ছোটকে বড় করা, অসমানকে সমান করা তাঁদের কাজ। নিঃস্বার্থ ভাবে সে টুকু করে গেলে নিজ নিজ দেশ বা জাতির যথেষ্ট কল্যাণ হয় তাঁদের দ্বারা। ঐ ব্যক্তিগত প্রভাবটুকুকে গণ্ডীবদ্ধ করে সম্প্রদায় বেঁধে ফেললে তাঁদের জীবনের পরে যেটুকু বিশেষ অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় জাতির পক্ষে, দেখা যাচ্ছে দল বাঁধার গোল বাধে ঐখানে। আজ খোলা পথের দিন এসেছে—দেওয়া-নেওয়া যা-কিছু সব খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে' চলতে হবে, তবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে মানুষ জাত। পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে মানুষের যা আছে সব কিছু। সমাজ শক্তির বেড়া, শাসন মানিয়ে চেপে রাখা হয়েছে যাদের এত কাল, পৃথিবীর খোলা পথের হাওয়া এসে ঢুকেছে তাদের ঘরে—সাড়া পৌছেছে তাদের প্রাণে। ছাড়তে হবে তাদের জন্য অনেক কিছু—দিতে হবে তা দি'কে অনেক অধিকার। কে জানে তাঁদের মধ্যে কত মহাপুরুষ, মহানারী জন্মাতে না পারে সুযোগ পেলে। ঐ শ্রেণীর মধ্যে বিশিষ্ট মানুষের উদ্ভব ইতিহাসের পাতায় অনেক বার দেখা গেছে। সচেতন হয়ে সহজে এটুকু মিলিয়ে নিলে গোল চুকে, নতুবা সমাজের বুকে মহা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ছোট বড় হবে, অধীন স্বাধীন হবে সুনিশ্চিত; মানেমানেই এটি করে ফেলা ভাল।

মিলন-ক্ষেত্র

উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে পংক্তি ভোজনের খবর পাওয়া যাচ্ছে চারি দিক

থেকে। স্কুল কলেজগুলি অগ্রণী—দেব মন্দিরেও এ সম্বন্ধে উদ্যোগ-আয়োজন চলছে কিছু কম নয়। হৃদয়বান হিন্দু আজ হৃদয় পেতেছে আব্রাহ্মণ চণ্ডালের জন্য সমান ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমিতি, বালিকা বিদ্যালয় ও কলিকাতা সহরের কর্পোরেশন স্থাপিত নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে অচিরাৎ দলে দলে নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষার জন্য ঢুকে পড়েছে দেখা যাবে, আশা করা যায়। ছেলেদের ব্যবস্থা ত আগে হতেই সুরু হয়েছে।

শিক্ষায় সমান হলে কে কাকে চেপে রাখে

অনেকে বলবেন "সব জাতের মেয়ে পুরুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে দেশের জাত-ব্যবসাগুলি লোপ পেতে বস্‌বে সমুলে। জেলেনী মাছ বেচতে, গয়লানী দুধের মাখন তুলতে, তাঁতিনী তুলা পিঁজতে ও সূতায় মাজা দিতে ভুলে যাবে জন্মের মত। ফলে দেশে ছোটদের অর্থকরী বিদ্যা যাও বা দু' চারটা এখনো অবশিষ্ট আছে, তাও ঘুচে গিয়ে ছোট বড় সবাই হা অন্ন, হা অন্ন করে ঘুরে বেড়াবে দুয়ারে দুয়ারে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, এ কথাটির ভিত্তি তেমন পাকা নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধি স্বতন্ত্র জিনিষ, যার থাকে সেই কৃতকার্য্য হয়। পাকা ব্যবসাদারের ছেলে বাপের আঁটসাট গোছান ব্যবসাটি ব্যর্থ করেছে দেখা গেছে অনেক সময়। অতএব কোন বিশেষ ব্যবসায় কোন শ্রেণীর বা পরিবারের একচেটে হবে, এমন বলা যায় না। অন্নের অভাব হলে রোজগারের পথ দেখে' বলে' দিতে হবে না কাউকে। প্রাণের দায়ে সবাই তখন রোজগার কর্‌তে ছুটবে ও নিজের শক্তি, রুচি অনুযায়ী একটি পথ ধরে নেবে—যেটি পারে। বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'লে ও জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়লে জাতির মঙ্গল বুঝতে শিখবে প্রত্যেক মানুষ, সেটি সবচেয়ে বড়

কথা। অর্থাগমের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়তে হবে। তাতেই দেশের মানুষ শিক্ষা লাভ কর্‌বে রকম রকম বিষয়ে। মূল কথা, কর্ম্ম বর্ণগত না হয়ে বুদ্ধি, শক্তি ও রুচিগত হবে, এটিই স্বাভাবিক।

সার্ব্বজনীন পূজা

ভগবানকে ডাকা সম্বন্ধে সময় সময় মানুষের মনে স্বতঃই একটি প্রেরণা জাগে। মানুষ-জগতে এটি নূতন ব্যাপার নয়। আদিম কাল থেকে কত মানুষ তার বেগ নিজের অন্তরে অনুভব করেছে। তার ভাবটি মানবভাষায় ফুটিয়ে তুলতে কতজন কত চেষ্টা পেয়েছে। ফোটা আ-ফোটা ভাষায় রচিত তাদের সেই মর্ম্মগাথাগুলি আজও লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে মানুষ-সমাজে। বাউল, ফকির, গায়ক ছড়ায় গান গেয়ে ফিরছে তার ভাবগুলি আজো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। কেউ বলে, ও-জিনিষটি মানুষের শুনে শেখা অভ্যাসের গতানুগতিক ফল, এর মূলে কোন বিজ্ঞান-সঙ্গত সত্তা নেই। কেউ বলে,—শুধু শুনে শেখা নয়, গোড়ায় মানুষদের মনে ভাবটি এল কোথা থেকে? ওটি মানুষের সহজাত আর পাঁচটি সংস্কারের একটি—মানুষের জন্মবীজটিকে আঁকড়ে ধরে' রয়েছে প্রথম থেকে। গভীর অনুভূতিতে তলিয়ে গিয়ে জ্ঞানীরা বলেন,—ঠিক তার উল্টো! তাঁদের মতে সব রকম সংস্কারের মোটা গণ্ডী কাটিয়ে তোলার ঐ-টিই বীজমন্ত্র—মানুষ নিছক সত্য হয়ে ধরা দেয় নিজের কাছে এর ফলে। মূল কথা, যে যাই বলুক মানুষ-রাজ্য থেকে জিনিষটি কিন্তু লোপ পাচ্ছে না কোন রকমে। একজন ছাড়ে ত' দশজন ধরে, দশজন ছাড়ে ত' বিশজন ধরে।

এই চৈতন্যঘেঁসা ব্যাপারে মানুষ এখনো তার বড় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছায় নি বটে কিন্তু চেষ্টা চলছে সেইদিকে। বিজ্ঞান-জগতে জড়-

চেতনের সমন্বয় ব্যাপারটি যখন পুরামাত্রায় ঘটে যাবে মানুষ-জগতে তখন এক আশ্চর্য্যতর নূতন যুগ দেখা দেবে। মানুষ স্পষ্ট চোখে দেখবে একদেহে অভিন্ন হয়ে জড়চেতনে জড়িয়ে আছে কেমন করে। বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে চলেছে সেই খোঁজার অভিমুখে। এক দিকে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে অন্যদিকে মানুষ ভগবানকে ডেকে চলেছে; মাঝ পথে দুয়ের কোলাকুলি হবে বড় রাস্তায়।

মুসলমানজগৎ এক আল্লার নাম ডাকে—তাদের এক ছাড়া দুই নাই, তাই সহজে সকল মুসলমান একনামে ঐক্যবদ্ধ। ঈদের নমাজের অপূর্ব্ব ঐক্যদৃশ্য যে দেখেছে সেই জানে, এক আল্লা নামের শক্তি কি মহান। খৃষ্টানজগৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই দুই নামে সারা খৃষ্টানমণ্ডলী ঐক্যবদ্ধ। মানবসেবার অসাধ্য সাধন করেন তাঁরা ঐ দুই নাম মাথায় নিয়ে।

অসংখ্য নামরূপের ঢাকনায় ঢাকা হিন্দুর পূজা উপাসনার মধ্যে চৈতন্যগত একটি অখণ্ড ঐক্য-সূত্র আছে—উচুদরের শাস্ত্র, জ্ঞানীর জ্ঞান, ও কয়েকটি মূলমন্ত্রে সেটি আটক্ পড়ে গেছে কেমন করে কে জানে। সর্ব্বভূতে এক চৈতন্যময় কথাটি তাই আজ হিন্দুর কাছে পোষাকী হয়ে রয়েছে, আটপৌরে ভাবে তার চল নাই তেমন সকলের মধ্যে। মনুষ্যত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে জাতির কল্যাণে একজোট হয়ে সকল হিন্দুকে আজ তাঁদের ঐ বড় কাথাটি বেঁটে দিতে হবে ছোট বড়, ইতর ভদ্র সকলকে সমান ভাবে এনে দিতে হবে তাদের ধারণায় তার ভাবটি একান্ত সহজ করে; ব্যবহারে তার পরিচয় দিতে হবে প্রতি মুহূর্ত্তে। তবেই হিন্দুর জন্মগত চৈতন্যবীজটি সাড়া দিয়ে উঠবে সকলের মধ্যে; এক করে বাঁধবে সকল হিন্দুকে এক চেতনায়, তখনই সত্য হবে সার্থক হবে প্রকৃত সার্ব্বজনীন পূজা। তার আয়োজন দেশে যত হয় জাতির ততই কল্যাণ।

দুর্ব্বলতার দায়

দুর্ব্বলতার দায় এড়িয়ে চ'লতে পারে ক'জন মানুষে? কোন না কোন দিক থেকে তার আক্রমণ কিছু না কিছু সইতে হয় প্রায় সকলকেই। গোড়া থেকে গায় জড়ান, মনে মাখান বুদ্ধিতে আঠার মত লাগান ঘরভাঙা, স্বার্থরাঙা, ঐ না-থাকা জিনিষটির থাকার জোরে মানুষ নাকাল হচ্ছে কতখানি, অনর্থ ঘটাচ্ছে কতদিকে কে না জানে? আজ জাতি-গঠনের বিশিষ্ট যুগে তার দিকে নজর পড়েছে সকল মানুষের। সবাই খুঁজছে তার ছোট বড় রন্ধ্রগুলি, ফাঁক পেয়ে কলি যেন প্রবেশ করতে পথ না পায় নলের শরীরে সহজে। অশুভ ঐ কলি দেবতাটি মৌলিক আকার নিয়ে ঘোট বেঁধে চেপে বসতে পারে জাতীয় চরিত্রের যে জায়গায় চোখ ফেলতে হবে আজ সেইখানে—আলোচনা করতে হবে তারই।

টাকা লেনা দেনা ও পুরুষ নারীর সম্বন্ধ বাঁচান ব্যাপার নিয়ে কলির কারবার চলে বেশী। যে জাতির মানুষ অপরের পাওনা কড়ি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে কাতর অধিকন্তু প্রতিবেশী আত্মীয় বান্ধব এমন কি সহযোগী সহধর্ম্মী সহব্যবসায়ীকেও না দিয়ে, সুযোগ পেয়েই ফন্দি খাটিয়ে ছেঁদো কথা কয়ে কখনো বা ভয় দেখিয়ে একে অন্যের টাকা আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত সে জাতির মান প্রতিষ্ঠা, ধন সম্পদ ব্যবসাবাণিজ্যের সাজান ভরা কলির প্রভাবে সর্ব্বনাশের মধ্যে ডুবে যায়। সারা প্রকৃতি তার প্রতিকূলে কাজ করে, সে অনর্থপাত ঠেকায় কে?

অন্যদিকে যে জাতির পুরুষ নারী উন্নত মানবসভ্যতার যুগে উন্নততর মঙ্গল বুদ্ধি জাগিয়ে, পরস্পরের ব্যবহারে সামঞ্জস্য বাঁচিয়ে চলতে না শিখে, ফিরে আবার আদিম অসভ্য অবস্থার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়, তার চর্চ্চার আনন্দ পায়, জীবন কাটায়, সে জাতির পুরুষ নারী ভাবী পৃথিবীর

নূতনতর আনন্দমূর্ত্তির দর্শনে ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকে। আদিম অসভ্য ক্রমশঃ তাদের পিছু হটিয়ে জড় গাছ পাথরের ও হিংস্র বাঘ ভাল্লুকের সামিল করে ফেলে; জড়ত্ব, দাসত্ব ও পশুত্ব তখন তাদের ভাগ্যলিপির বিষয় হয়। কলির প্রবল প্রতাপে মূঢ় নারী তখন বিষপাত্র তুলে ধরে পুরুষের মুখে, হিংস্র পুরুষ নারীকে ছারখার করতে থাকে যেখানে পায়।

এই দুটি দিক থেকে জাতির মানুষদের আজ কলিকে তাড়াতে হবে ঝড়ের বেগে ঝাঁট দিয়ে, রুখতে হবে তার কারবার মানুষের রাজ্যে— আনতে হবে সত্য বুদ্ধির জাগরণ জাতির মধ্যে নতুবা জাতির মেরুদণ্ড খাড়া থাকতে পারবে না—গঠন বিকৃত হয়ে বেঁকে পড়বে কোন-না-কোন দিকে।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবী জুড়ে নূতন গঠনের একটি প্রেরণা জেগেছে। সকল সভ্যজাতি মানুষ তৈরীর কাজে উঠে পড়ে লেগেছে, এদেশেও সে কাজ সুরু হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অতি ক্ষীণ আকারে। এ জাতির শক্তি ও সাধ্য কত দিকে বাঁধা পড়ে গেছে কে না জানে? ভরসা ভগবান ও তাঁর প্রেরিত অব্যর্থ প্রেরণায় অপ্রতিহত স্থির বেগ।

সেই প্রেরণা মাথায় নিয়ে কলির বাঁধন কাটিয়ে বুকে পাথর বেঁধে, ছোট বড় একত্র হয়ে এ-জাতিকে আজ পার হতে হবে—মানবসভ্যতাকে এগিয়ে দিতে হবে প্রত্যেকটি প্রাণের শেষ সম্বল দিয়ে, তবেই এ জাতি মাথা তুলে নূতন পৃথিবীর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বেঁচে থাকতে পারবে ভগবানের ইচ্ছায়।

যে জাতি পৃথিবীর কাজ না করবে ভাবীকালে তার আর স্থান থাকবে না এ-পৃথিবীতে।

শিক্ষাভবনের উদ্বোধন

একগ্রামে একটি শিক্ষাভবনের উদ্বোধনের দিন স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে অনেকগুলি বিধবাকে উপস্থিত থাকৃতে দেখে আনন্দ বোধ কর্‌লাম। তাঁদের কাজ, তাই তাঁরা বড়ই আগ্রহ করে এসেছিলেন ও সব কথাই যেন প্রাণ দিয়ে শুনেছিলেন। ঘরের কাছে শেখার সুযোগ পাওয়া তাঁদের কম সৌভাগ্য নয়।

এই সঙ্গে আর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। গ্রামে অথর্ব্ব, অক্ষম, কতজন বিধবাকে উদ্যোক্তা এক মাসের মত চাল ও ডাল মেপে দিলেন। দু'চারজন একখানা করে নূতন কাপড়ও পেল। শুনলাম, প্রতি মাসে নাকি এই রকম হয়। নির্জ্জনে নীরবে এই পূণ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। বাইবেলে লেখা আছে—"ভগবানের নামে গোপনে যে কাজ করা হয় ভগবান প্রকাশ্যে তার পুরস্কার দেন।" এই বাণীটি এখানে সফল হোক—এই প্রার্থনা।

পথের আলাপন

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেশনে শেষরাত্রে চল্‌তি ট্রেনে তাড়াতাড়ি একটি ভদ্রমহিলা উঠে পড়্‌লেন—সঙ্গে একটি তরুণী। কামরার সকলেই তখন শুয়ে। তাঁরা দুজনে উঠে বেঞ্চের একধারে বস্‌লেন—সাড়াশব্দ নেই কারু মুখে।

ক্রমে আকাশ ফর্‌সা হ'য়ে আস্‌তে লাগল; যে যার জায়গায় উঠে বসল। কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল—হাওড়া আর কতদূর দেখ্‌বার জন্য। মনে হ'ল, ভদ্রমহিলাটি যেন কথা কবার জন্য উস্‌খুস কর্‌ছেন। হঠাৎ বল্‌লেন,—"আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি; চিনি-

চিনি মনে হ'চ্ছে। কয়েক বৎসর আগে কি আপনি বেলুড় সমিতিতে গিয়েছিলেন ?"

বল্লুম,—'হাঁ'।

তিনি বল্‌লেন,—"আমাকে আপনার মনে থাক্‌বে না অত লোকের মধ্যে ; আমি কিন্তু আপনাকে চিনে রেখেছি। আপনিই বুঝি পুরীতে বিধবাশ্রম করেছেন ?"

বল্লুম,—'না আমি নই—বসন্তকুমারী দেবী করেছেন। তাঁর অবর্ত্তমানে আমি সেখানকার কাজকর্ম্ম দেখি মাত্র।'—

"যা' হোক্, এখন আপনার উপরেই ত সেখানকার ভার···"

—"হ'তে পারে।"

—"আপনার সঙ্গে পরিচয় করে' রাখা ভাল ; কখন কি দরকার হয়, বলা ত যায় না। এই দেখুন না, ১৮ বছরের আইবুড়ো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ফির্‌ছি। চাক্‌রী ছাড়া উপায় কি! বিয়ে—সে ত আজকাল অসম্ভব! স্বদেশীর হাঙ্গামে ছেলেগুলো ত বিয়ে কর্‌তেই চায় না—মেয়েরাও তা'ই। আমি বাপু ছোট থেকে মেয়ের কানে তুলে রেখেছি—বিয়ে নয়, চাক্‌রী। সেই ভাবেই সে মানুষ হয়েছে। মামা বলেন,—'মেয়ের বিয়ে দে, বিয়ে দে।' মামার কাছে খড়্গপুর গিয়েছিলুম, তিন মাস রইলুম,—কই মামা ত একটাও বর জোটাতে পার্‌লেন না। ফিরে চলেছি—হাওড়ায় নেমে চেৎলা যাব। চেৎলায় বাড়ী।"

মহিলাটি অনর্গল বলেই চল্লেন—"আজকাল আবার লোকে বলে, বিধবার বিয়ে দাও। কুমারীরই বর জোটে না,—তা' আবার বিধবার বর! ছেড়ে দাও ওসব কথা ;—চাক্‌রী করুক্—ভাত খাক্—সোজা ব্যবস্থা।"

মেয়েটির সুপাত্রে বিবাহ দিতে না পারায় মা'র মনে একটি বেদনা

আছে। তারই ঝাঁঝে তিনি এত কথা বলে গেলেন, মনে হ'ল। বললুম—'ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুপাত্র পেয়ে যাবেন, হ'য়ে যাবে আপনার মেয়ের বিয়ে—বিবাহ হওয়াই মঙ্গল। তবে চাক্‌রীর চেষ্টা রাখা ভাল।'

গাড়ী হাওড়ায় এসে পৌঁছল। নাম্‌বার সময় মহিলাটি বলে' গেলেন—"মনে রাখ্‌বেন আমাদের কথা; প্রয়োজন জানালে অনুগ্রহে বঞ্চিত না হই।"

ঘটনাটা এক বৎসর আগের। এদের কথা মন থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আজ সকালের ডাকে একখানা চিঠি পেলুম। চিঠিতে লেখা—

"আমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে। জামাই বি-এ পাশ, চাক্‌রী নাই, বাড়ী নাই, খদ্দরের ব্যবসা। চেৎলার বাড়ীতে ওদের রেখে আমি চাক্‌রীতে যেতে চাই। পুরী আশ্রমে আমাকে একটি চাক্‌রী দিতে পারেন কি? আপনাকে খুব ভালোবাসি, তাই সহজে সকল কথা আপনাকে জানাতে পারলুম। ইতি—"

চিঠিখানা পড়ে' ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, তাই ত! উপার্জ্জন দেখ্‌ছি মেয়েদের সব সময়েই দরকার—কুমারী জীবনে, বৈধব্যে,—সময়ে সময়ে সধবা থেকেও।

মাতৃত্বের নমুনা ও দেশী বিদেশী গৃহস্থালী

অনেকের ধারণা সাবেকী আমলের সব-কিছুই অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ মানুষের সংস্কারগত অভ্যাসের জের মাত্র। জ্ঞানগত করে' সাবেক আমলের মানুষরা যেন কোন কিছুই মানব-সমাজকে দিয়ে যেতে পারেন নি। আধুনিক ব্যাপারগুলিই কেবল যেন বিজ্ঞানসম্মত। এবিষয়ে আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

জীবজগতের কতকগুলি সংস্কার প্রকৃতিদত্ত বা জন্ম থেকে পাওয়া। কতকগুলি আছে শেখা কথা এমন করে' মনে বসানো যে মনে হয় এগুলিও বুঝি সহজাত সংস্কারেরই সামিল। কিন্তু তা যে নয়, চিন্তাশীল লোকেরা তা জানেন। তবে সাধারণ বুদ্ধির লোকদের জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা, তাই তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে বলার কিছু আছে।

সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ জন্মগত সংস্কারের মধ্যে একটী বিশিষ্ট সংস্কার। এটি নষ্ট হ'লে প্রাণিজগৎ ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়বে, কে না জানে!

এক শ্রেণীর নারী আছেন, তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম হ'লেও, পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির মধ্যে তাঁদের নমুনা দু' পাঁচটি দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই, যাঁরা বিশেষভাবে প্রণয়িনী-স্বভাবা। মাতৃত্বের ভাব ফোটেনা তাঁদের মনে কোন কালে, এমন কি নিজের সন্তান হ'লেও! জাতির গাছে তাঁরা কাঁচা ফল—পরিণতির রসে বঞ্চিত তাঁরা চিরদিন; কিছু সময় গাছে ঝুলেন টস্‌টসেটি, পরে শুকিয়ে খসেন, নয় পচে' ওঠেন পরিণামে ডালে থেকেও। আবার কোন অতি জ্ঞানী নারী এই সংস্কার-মুক্ত হ'য়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হ'তেও পারেন, অসম্ভব নয়। আরো বা কেউ রাক্ষসী চণ্ডালিনী প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল মা এ সংস্কারকে পুড়িয়ে ছাই করে' ফেলে সন্তানের মুখে বিষ তুলে' দিতে পারে, মাতৃজাতির এমন পৈশাচিক বৃত্তি থাকাও একান্ত অসম্ভব নয়। এই দুই অতিমাত্রিক ও অপরিপক্ক কাঁচা ধাতের মানবীদের বাদ দিলে একটী সাধারণ শ্রেণীতে নারী জাতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা জননী, জীবধারিণী, অন্য কথায় যথার্থ মা। এঁদের মধ্যে অনেক নিঃসন্তান বিধবা ও চিরকুমারীর স্বভাবেও মাতৃত্বের সংস্কার প্রবল দেখা যায়। পৃথিবীর পথে তাঁরা অসংখ্য সন্তান জড় করতে থাকেন এই সংস্কারের বশে।

এই সকল মা'রা বর পেলে ঘর সাজাতে ও সন্তান হ'লে সংসার বাঁধ্‌তে থাকেন সুন্দর করে' স্বভাবের নিয়মে। শিক্ষা পেলে এঁরাই সংস্কারের স্থূল গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ ক্ষেত্রে সংস্কারটিকে ব্যাপ্তকরে উজ্জ্বল মুর্ত্তিতে তুলে ধরতে পারেন দশের সামনে ও লাগাতে পারেন সমাজের কাজে। আজ তাঁদের নিয়েই কথা।

দেশী বিদেশী সকল মেয়েই মাতৃত্বের সংস্কার নিয়ে গৃহস্থালী পেতে থাকেন দেশে দেশে। যাঁরা বিদেশে যান নাই, বিদেশের মেয়েদি'কে যাঁরা নিজেদের গৃহস্থালীর মধ্যে দেখেন নাই তাঁরা কল্পনা করে' নেন বিদেশের সব মেয়েই বুঝি খবরের কাগজে ছবি-বেরুনো মেয়ে—তাদের বুঝি ঘরকন্না নেই! তাঁরা জানেন না যে, তিন জন মেয়ের খবরের কাগজে ছবি দেখেন ত' বাকী থাকে তিন লক্ষ মেয়ে, যারা প্রতি দিন গৃহস্থালী পেতে ঘর করছে নিজের দেশে। এদেশের মেয়েরা এদেশী ধরণে গৃহিণীপনায় কম পটু নয় অনেকে। আবার বিদেশী ধরণে বিদেশের মেয়েও গৃহিণীপনায় কম পটু নয় অনেকে—তাদের দেশে, তাদের সমাজের অনুকূল হ'য়ে।

আজ দেশ বিদেশের যোগাযোগের যুগে গৃহস্থালী-ব্যাপারেও এর একটি সমন্বয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী। এ-দেশের পাকা গৃহিণীদেরও ঘড়ি ধরে কাজ করার অভ্যাস নেই বলে' সময়জ্ঞানের মাত্রা থাকে না তাঁদের সকল কাজে। এটা তাঁদের শুধরে নিতে হবে আজকের দিনে। কারণ, আজকে এই ঘরের বাইরে ঘড়ি ধরে' চলার যুগে তাঁদেরও ঘড়ি ধরে ঘরের কাজ সারতে হবে বাইরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। নতুবা বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন না কোন মতে; সেটা ভালো নয়, সুখেরও নয়। পারিবারিক জীবনে বিদেশী মেয়েরা এ বিষয়ে খুব তৎপর ও পটু। এই দেশের মেয়েরা নিজেদের তরফে যুক্তি খাটিয়ে

বলেন, "তাঁদের স্বামীটি ও ছেলেটি নিয়ে ঘর, আমাদের মত আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বের ভারবহা ও দায় পোহানো কর্ম্ম নয় তাঁদের। এতগুলি ঘাড়ে চাপলে হেলে পড়্‌বেন তাঁরা দু দিনে,—বেতালা হ'য়ে যাবেন প্রতিপদে। আমরা ছাড়তে চাই না আত্মীয়, তাতে সুখ পাই না মোটে।"

ছোট ঘরের কাজ সামলে বিদেশী মেয়েরা বাইরের বৃহৎ ক্ষেত্রে বৃহৎ সমাজের সেবায় কতখানি সময় দেন, পরিশ্রম স্বীকার করেন, সে খবর রাখেন না এ'রা আদৌ। এ দেশের মেয়ে, সময় বাঁচাও, ঘর সামলাও, নূতনের যোগে পুরাতন ঘরকে গুছিয়ে তোল নূতন করে', আত্মীয়স্বজন—কুটুম্ব নিয়ে তোমার বড় সংসারটিকে সামলে তুলে' বাইরে দেখাও তার স্বরূপটি,—তবেই বোঝা যাবে তোমার গুণপনা—সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা সমাজসেবায় হাত বাড়িয়ে পথ খুলে দাও জাতির গঠন-কাজে। এতে হার মানলে চলবে না এ-যুগে।

আয়োজন চাই

এদেশে হিন্দুঘরের মেয়েরা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে অভিভাবকদের মেনে চলেন, চলতে ভালও বাসেন এবং এটা মঙ্গলজনক বলে' আমরাও মনে করি। অভিভাবকের সঙ্গে যোগে কাজ সহজও যেমন শোভনও তেমন, সুবিধাও তাতে অনেকখানি। অনেক হিন্দু বিধবা আছেন, যাঁদের সন্তান নাই—সংসারেও বিশেষ কিছু করতে হয় না, হাতে সম্বলও কিছু আছে,—অভিভাবকরা আয়োজন করে' সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়ে দিলে ছোটজাতের রাস্তায়-ঘোরা ছেলেমেয়েগুলিকে জড় করে এ'রা ঘরে ব'সে অবকাশ সময়ে তাদের কিছু শেখাতে পারেন,—ছবি দেখান, লেখান, গণতে শেখান, তা ছাড়া হাতের কাজ, খেল্‌না তৈরী, পুতুল গড়া ইত্যাদি করাতে পারলে, তারা আমোদও পায় ও সেগুলি বেচে

দু'চার আনা সংগ্রহ করতে পারলে ঘরের লোকেরাও খুসী হয়ে রোজ তাদের পাঠিয়ে দেয়। বেকার বিধবারাও হাতে একটা সুন্দর কাজ পেয়ে মনের খুসীতে থাকেন, বাড়ীতে খিটিমিটিও বাধে কম; আর এতে করে' অবনত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি মনে একটা দরদও জন্মায় ধীরে ধীরে। পরিবারে নুতন খোকা খুকী জন্মালে আটকৌড়ে, ষষ্ঠিপূজা প্রভৃতি মঙ্গল অনুষ্ঠানে ঐ সব ছোট জাতের ছেলেমেয়েগুলিকে চিড়ে মুড়ি, আনন্দ নাড়ু দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে জলযোগ করালে এরা আমোদ করে কুলো পিটে পাড়া গুলজার করে' তুলবে—সুখবরটা ছড়িয়ে দেবে পথে ঘাটে, চারিদিকে। এটা কি সুন্দর ব্যবস্থা নয়! ছোটয় বড়য় মেলা দরকার সব সময়ে। দু'চার জন শিক্ষিত ভদ্র-মহিলা রাস্তার ছেলেদের কুড়িয়ে এনে জড় করে কিছু কিছু শেখাচ্ছেন, দেখছি; কিন্তু এটা পাড়ায় পাড়ায় দরকার। বর্ত্তমানে এ কাজটি সময়োপযোগী হবে সব দিক থেকে, নয় কি? বাড়ীর পুরুষ অভিভাবকরা উদ্‌যোগ করে' মেয়েদের হাতে তুলে দিন এই কাজটি—মেয়েরাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে কাজটি ধরুন, এই চাই।

বিবাহ কিসে সুখের হয়

পৃথিবী জুড়ে' রব উঠেছে বিবাহ আজকাল একটী সমস্যার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ লোক বিবাহের ফলে সুখী হ'তে পারছে না—শোনাও যায়, দেখাও যায় কতক কতক। পৃথিবীর বড় বড় চিন্তাশীল লোকেরা এখন ভাবতে সুরু করেছেন, বিবাহ কিসে সুখের হয়। বিবাহ ব্যাপারটি ছোট-বড় নানা সমস্যায় জটিল। বড় দিকগুলি ভাব্‌বার জন্য বড় লোকরা আছেন; ছোট চিন্তার ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যেও কথাটিকে টেনে এনে আমাদি'কে নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে।

কারণ, বিবাহ করবে ছোট-বড় সবাই—কেউ প্রায় বাদ যাবে না তা' থেকে। অ-সুখের বিবাহে দেশ, সমাজ, পরিবার ও মানুষ ছারখার হয়,—এক কথায় সর্ব্বনাশ ঘটে—কে না জানে? নানা কারণে বিবাহ অ-সুখের হয়। প্রথম—অভাব অনটন। অনটনের সংসারে মানুষ সুখী হ'তে পারে না কোনমতে—হাজার বলো, হাজার বোঝাও বিবাহের হাজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শোনাও। তাই বিবাহ করতে গেলে সংসার স্বচ্ছল করা চাই সকলের আগে। শুধু ধনে স্বচ্ছলতা আনে না। দৃষ্টান্ত—

সোনা চাঁদি চকমকিয়ে ধনীর মেয়ে ঘরে এল—চমক লাগল শ্বশুর শাশুড়ী পাড়া-প্রতিবেশী সবার চোখে। দুদিন বাদে ধনটা যখন খাপ খেয়ে গেল ঘরের সঙ্গে, খুঁৎ বের হ'ল বৌয়ের তখন অলসতা-বিলাসিতার। কথা উঠল, ধনীর মেয়ে একগুণ আনে ত দশগুণ খরচা বাড়ায়। এ কি বাপু পোষায় গৃহস্থ ঘরে! প্রতিবেশীরা ছড়া কেটে বলতে লাগল—'ধনীর ঝি ধনে মানায়, নির্ধনের ঝি গতর খাটায়।' গতর খাটানোটাই বাপু চিরদিনের। 'শুধু ধনে ক'দিন যায়, হীরা মোতি কেইবা খায়।' দেখ না ও-বাড়ীর বোসেদের বউ—পরিপাটি কাজের গুণে বাড়ী-খানিকে করে' রেখেছে কেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আগাগোড়া। যেদিকে চাও—লক্ষ্মীশ্রী! দু'চার টাকায় গুছিয়ে কেমন সংসার চালায়, অভাব জানতে দেয় না কাউকেও..."

এমনতর পরিশ্রমী গুণের বউ আজও আছে অনেক ঘরে। স্বাধীন উপার্জ্জনশক্তির অভাবে, স্বামীর অবহেলায় ও অনেক সময় শাশুড়ীর অন্যায় জুলুমে তারা পিষে যায় দিনে দিনে। দজ্জাল শাশুড়ী, দুশ্চরিত্র স্বামী ও উদ্ধতা মুখরা বউ এ দেশের পারিবারিক জীবনকে কতখানি অ-সুখের করে' তুলে, সবাই জানে। স্বামী সচ্চরিত্র, শাশুড়ী সহৃদয়

ও বউ গুণের হ'লে তবেই সংসার সুখের হয় সকল দিকে। তিনের একটির অভাবে 'সংসার নষ্ট, সকলের কষ্ট।' তিনটির যোগাযোগ হয় কিসে?—সকল মানুষ শিক্ষিত হ'লে, নিজের ভালো সবাই বুঝ্‌তে শিখ্‌লে।

পশ্চিমের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদ এনে ফেলে সংসার সুখের হবে, এ ধারণা আমাদের নাই। এ দেশের ধাতে ওটি সয় না, সমাজেও মানায় না—আগাগোড়া বেখাপ্‌ হ'য়ে দাঁড়ায় শেষে। অনেক সাহেব-সাজা বড় লোককে জীবনের শেষে বল্‌তে শোনা গেছে—"ভুল করেছি দেশের ব্যবস্থা ছেড়ে'।"

পশ্চিমী বড় লোকদের খবর আমাদের ভালো জানা নাই। এবং ইংরাজ ছাড়া পশ্চাত্যের অন্য জাতি সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। ইংরাজ পাদ্‌রী-প্রফেসার জাতীয় অনেকগুলি খাঁটি ভদ্র পরিবার দেখা আছে যাদের সংসার একান্ত সুখের। স্বামী-স্ত্রীর গুণপনাই তার কারণ। কিন্তু ঐ সকল পরিবারের উৎপত্তিকারিণী মা'দিকে যখন বার্দ্ধক্যে ও বৈধব্যে একাকী নির্জ্জনে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে বাস কর্‌তে দেখা যায়, তখন প্রাচ্য সংস্কার মনকে পীড়িত করে। ছেলে-বৌয়ের নিত্য সেবা পাওয়া চাই বিধবা জননীর শেষ-দশায়। এটিই সুন্দর,—এটিই সুখের,—এবং লোকধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম হিসেবে এটিই কল্যাণকর!

সকলের জীবন সত্য হোক, সকল সংসার সুখের হোক্‌,—মানুষ জন্মাক্‌ দেশের ঘরে।

বড় হওয়ার লোভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী যুবকরা ছাত্র-জীবনে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করেন। এটা ভাল। এখানকার শিক্ষা শেষ করে'

উচ্চতর শিক্ষা ও বড়দরের ডিগ্রী পাওয়ার জন্য বিদেশগমনে একান্ত ইচ্ছুক হন; এটাও ভাল। উচ্চতর শিক্ষা সুসম্পন্ন হ'য়ে ওঠা যাঁদের জীবনে সহজ হয় তাঁরা ভাগ্যবান। অনেকে প্রতিভার বলে বৃত্তিলাভ ক'রে বিদেশ যান; সেটা গৌরবের বিষয়। নানা প্রকার চেষ্টা উদ্যোগের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করে' যাঁরা বিদেশগমনে সমর্থ হন, তাঁরাও প্রশংসার পাত্র। মাঝে মাঝে শোনা যায়, কোন কোন কৃতী ছাত্র বাঁকা-পথে কৃতকার্য্য হওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন—বাপকে না জানিয়ে ও ভিন্ন কারণ দেখিয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা বের করে' নিয়ে লুকিয়ে পালানো। কেউ বা মা-বাপ উভয়কে না জানিয়ে স্ত্রীর গায়ের গহনা নিয়ে বেচে' চলে' যান; পৌঁছে বাপ মাকে খবর দিয়ে টাকা চেয়ে পাঠান। একাজগুলি অশোভন হ'লেও তবু সহনীয়। কিন্তু কেউ কেউ বিবেকবুদ্ধিকে বলিদান দিয়ে নিজের প্রথম জীবনের গ্রামের বিবাহ গোপন করে' সহরে ধনী গৃহে পুনরায় কৌশলে বিবাহ করে' শ্বশুরের টাকায় বিদেশযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ ও ব্যয়সঙ্কুলানের চেষ্টায় থাকেন। এরূপ কয়েকটি ঘটনাই আমাদের কানে এসেছে। বেশীর ভাগ সময় তারা অকৃতকার্য্য হয়েছে—সময়মত কৌশলটী ফেঁসে গেছে, লজ্জার সঙ্গে সরে' পড়্‌তে হয়েছে, এটা চোখে দেখা। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটী জায়গায় বিপদ ঘটেই গেছে—এরূপ একটী দৃষ্টান্ত এখানে আলোচনা করা যাচ্ছে।

ধনী বাপ উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন সুপাত্র দেখে' মেয়ের বিবাহ স্থির কর্‌লেন। বিয়ে দিয়েই বিলাত পাঠাবেন—সব ঠিক। মেয়ে মাতৃহীন, তাকে মানুষ করেন এক বিধবা পিসীমা। তিনি মৃত্যুশয্যায়; একান্ত ইচ্ছুক—কন্যাসমা ভাইঝির বিবাহ দেখে' যাবেন। কন্যার বাবা সেজন্য বিনাঘটায় বিবাহের আয়োজন করেছেন। সদ্য বিবাহ,—দেরী করার

উপায় নাই,—একদিকে পিসীমা মৃত্যুমুখে, আর একদিকে টার্ম্‌ চলে' যায় ভর্ত্তি হবার। পাত্রী সুশিক্ষিতা আই-এ পাশ—পাত্র এম্-এ। রাত্তিরে বিবাহ শেষ। পরদিন ভোরেই কুশণ্ডিকার পূর্ব্বে কন্যার বাবা একটি আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা পত্র পেলেন—

"বাবা, যাঁর সঙ্গে আপনাদের কন্যার বিবাহ দিচ্ছেন, তিনি আমার ধর্ম্মতঃ স্বামী—তিন বৎসর পূর্ব্বে আমায় বিবাহ করেছেন। আমি গ্রাম্য অশিক্ষিতা; তাই আপনার সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহের চেষ্টায় আছেন। বাবা, আমি অশিক্ষিতা হ'লেও নিদারুণ মর্ম্মপীড়া পাচ্ছি। আপনি বিবাহ দিবেন না। ইতি—"

পত্র পড়ে' কন্যার পিতা স্তম্ভিত—হতবুদ্ধি। মুখখানা তাঁর কালো হ'য়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে' পড়্‌লেন—কি দৈব-দুর্ব্বিপাক। কিছুক্ষণ পরে তিনি কাউকে কিছু না বলে' কন্যার কাছে গেলেন। বল্‌লেন,—'মা, সর্ব্বনাশ।"

চিঠিখানি তার হাতে দিলেন। চিঠি পড়ে' দুঃখে লজ্জায় অপমানে মেয়েটির মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হ'য়ে পড়্‌ল। সাম্‌লে নিয়ে বাপকে বললে—'বলুন গিয়ে তাঁকে তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে। জানিয়ে দিন বিবাহ অসম্পূর্ণ—এখানে তাঁর কোন দাবী দাওয়া নাই। চিঠির উত্তরে লিখে দিন—তাঁর স্বামীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হয় নি। চিঠিখানা ঐ লোকের হাতে না পড়ে—তা হ'লে স্ত্রীকে বিষম নির্য্যাতিত হ'তে হবে।'

নববিবাহিত জামাই তৎক্ষণাৎ বাড়ী হ'তে বহিষ্কৃত হলেন—বিলাত যাওয়ার আশা ভূমিসাৎ হ'ল একদণ্ডে।

বিধবা বেকার-সমস্যা

দেশ এখন নিজের উপর ভর করে' দেশের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান

গড়ে' তুলতে চাইছে—দেশের লোকের জীবিকানির্ব্বাহের সাহায্য কর্‌বার জন্যে। প্রতিষ্ঠান যেমন দরকার,—ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও সেই অনুপাতে দরকার। উচ্চশিক্ষা সকলের ভাগ্যে ঘটা সঙ্কট; হাতের কাজের দক্ষতায় এখন অনেককে অন্ন জোটাতে হবে। বেকার পুরুষদের যেমন অন্নসমস্যা—বেকার বিধবাদের ততোধিক। অন্নাভাবে অনেক বিধবাও মর্‌ছে, কেউ জানুক্ বা না জানুক্। বর্ত্তমানে বিধবাদের শিক্ষার জন্য যে তিনটি প্রতিষ্ঠান অছে—সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয় হিরণ্ময়ী বিধবাশিল্পাশ্রম ও বিদ্যাসাগর বাণীভবন—প্রয়োজনের তুলনায় সে যৎসামান্য।

অনেকটা চিন্তা করে' দেখে কলিকাতা কর্পোরেশনকে মফঃস্বলের ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা জানাচ্ছি, পাড়ায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার তাঁহা যেরূপ ব্যবস্থা করেছেন, সেই সঙ্গে বিধবাদের শিল্পশিক্ষার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় অবৈতনিক শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপন কর্‌লে দেশের একটা মস্ত অভাব দুর হয়। সরোজনলিনী শিল্পশিক্ষালয় থেকে যাঁরা বৎসরে বৎসরে পরীক্ষা পাশ করে' বেরুচ্ছেন, কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'য়ে ঐ সকল প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষালয়ে তাঁরা অনায়াসে কাটিং, তাঁত, গালিচা, সতরঞ্চি, জয়পুরী কাজ, এম্ব্রয়ডারী ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প শিখাতে পারেন! এরূপ ভাবে শিল্পশিক্ষা বিস্তার কর্‌লে অল্পদিনে শিল্পচর্চ্চা দেশব্যাপী হ'য়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বিধবারও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিধবারা কৃপাপাত্রী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা দেশের একটা শক্তিও বটে। তাঁ'দিকে কাজে লাগাতে পার্‌লে দেশ নিজে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পাবে। তখন বিধবারা ঠিক আর কৃপাপাত্রী থাক্‌বে না, দেশের বিশেষ একটী প্রয়োজনীয় জীব হ'য়ে দাঁড়াবে। কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সমাজ-সেবায় বাংলার নারী

ঘটনাক্রমে পুরীতে, বয়সে প্রবীণ এক বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। পুরীতে তিনি বাস করেন না—বেড়াতে গেছেন—সেখানে নিজের বাড়ী আছে সমুদ্রতীরে। আলাপ-পরিচয়ে বোঝা গেল মানুষটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বিচক্ষণ—অভিজ্ঞও বহুবিষয়ে। দেশের সকল খবরই তিনি রাখেন, নিজেও দেশের হাজার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশেষভাবে। প্রসঙ্গচ্ছলে কথা উঠলো শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েদের সমাজ-উন্নতিকর কাজে যোগ দেওয়ার। বল্লেন, আজকাল বাংলার অনেক মেয়েই ত শিক্ষিতা হ'য়ে উঠেছেন কিন্তু সমাজসেবার কাজে দরকার হ'লে প্রায় কাউকেই পাওয়া যায় না, এ বড় দুঃখের কথা। তিনি নাকি অনেক চেষ্টা করেও কোন শিক্ষিতা মহিলার তেমন সহায়তা পান নাই তাঁর সংশ্লিষ্ট নানা কাজে—কাজেই কথাটা বল্‌তে পারেন। অমন একজন গুণী লোকের কথা শুধু কানে শুনে ফিরে আসা গেল না, কথাটি মনে করে' নিয়ে এসে ভাল করে' ভেবে দেখতে হ'ল বাড়ী ফিরে।

বাঙালী সভ্যজাতি,—উচুদরের সভ্যতা ও ভদ্রতা প্রত্যেক ভদ্র বাঙালী পরিবারের পুরুষ-নারী উভয়ের স্বভাবে রক্তমাংসের মত জড়িত, সহজাত সংস্কারের ভাবে যুক্ত। বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা না হয়েও বাংলার মেয়েরা দেশীয় রীতিতে সমাজসেবা করে' আস্‌ছেন বহুকাল থেকে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পরেও মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাসমণি, পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী হেমন্তকুমারী সন্তোষরাজপরিবারের খ্যাতনামা দীনমণি চৌধুরাণী, জাহ্নবী চৌধুরাণী, রাজা রামমোহনের পৌত্রবধূ গোলাপসুন্দরী দেবী, জ্ঞানদা দেবী, স্বর্গীয়া হরিমতি দত্ত, লেডী বসন্তকুমারী চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি বাঙালী কন্যারা

এক অক্ষর ইংরাজী না পড়েও উচ্চাঙ্গের সমাজসেবা করে' গেছেন বহুতর দিক্ দিয়ে। গরীবের মেয়ের বিবাহ দেওয়া, গরীব ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নিজের সংসারের বহু বিধবাকে আশ্রয়দান, দূর নিকট সকল আত্মীয়ের অভাবমোচন, স্বজন-প্রতিপালন, দীনদরিদ্রকে পেট ভরে' খাওয়ানো প্রভৃতি কল্যাণকর সমাজসেবাগুলি তাঁদের নিত্য কাজের অঙ্গ। তা ছাড়া স্কুল, কলেজ, আশ্রম, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, পুকুর খোঁড়া, রাস্তা তৈরী ইত্যাদি তাঁদের অনেক লোকহিতকর কীর্ত্তিও দেশের মধ্যে জাজ্বল্যমান। শুধু ছিল না পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট জ্ঞান! তাই পৃথিবীর সঙ্গে যোগে তাঁরা চল্‌তে জান্‌তেন না, কর্‌তেও পারেন নাই পৃথিবীর সঙ্গে যোগে কোন কাজ। আর সদর দরজার চৌকাঠটি পার হ'তে পার্‌তেন না বলে' নিজের ব্যক্তিত্বও ফোটাতে পারেন নাই দশের মাঝে। ফলে আত্মবলের চেয়ে তাঁদের অর্থবলের দিকেই লোকের নজর পড়ে বেশী।

দিন বদ্‌লেছে, আধুনিক শিক্ষা সকল মানুষের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে—মেয়েরাও তা থেকে বাদ পড়েনি। পৃথিবীর সঙ্গে যোগে চলার জন্য তারাও এখন প্রস্তুত হ'চ্ছে সকল দিক থেকে। তবে ঘর সাম্‌লে বাইরের কাজে যাবার সুযোগ সুবিধা পান খুব কম মেয়েই। অনেকেরই ঘরে অভাব-অনটন প্রচুর। গ্রাজুয়েট মেয়েরা শিক্ষা শেষ করেই চাকরীতে ভর্ত্তি হচ্ছেন পরিবারের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য, প্রায়ই দেখা যায়। পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোনদের মানুষ করা—বিধবা মাকে অভাব জান্‌তে না দিয়ে সযত্নে তাঁর সেবা করা তাঁরা ধর্ম্ম বলে' মনে করেন খুব বেশী। পারিবারিক সেবার মধ্য দিয়েই তাঁরা সমাজসেবা করে' থাকেন প্রতিদিন। দায়ভাগে যথাযথ অধিকার না থাকায় অনেক শিক্ষিতা কুমারী ও বিধবাকে স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের পথ দেখতে

হয় গোড়া থেকে। যাতে অর্থ নাই শুধু স্বার্থত্যাগ তেমন কাজে যোগ দেওয়া তাই সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে সব সময় সহজে। অন্নের সংস্থান, শিক্ষা, সময়, সুযোগ ও পারিবারিক ঔদার্য্য সবই যাঁদের অনুকূল, ঘরে মা, বাপ, স্বামী, সন্তানের সেবার সঙ্গে সঙ্গে এখন তাঁরা বাইরে বিস্তৃত সমাজের সেবায়ও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হবেন—অন্যরা ঘর বাঁচিয়ে যতদূর পারেন সমাজ-উন্নতির কাজে সাহায্য করবেন, আমাদের বিশ্বাস। কারণ সময় এসেছে—যখন আর কারো স্থির থাকার উপায় নাই।

আশা করি, ঐ প্রবীন ভদ্রলোকটি সব দিক ভেবে দেশের মেয়েদের ভবিষ্যত সমাজসেবার কাজ সম্বন্ধে অনেকটা আশান্বিত হবেন।

উপার্জ্জনক্ষেত্রে নারীর ভীড়

দলে দলে মেয়েরা এখন উপার্জ্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ছেন। এতদিন এ ক্ষেত্রে অসাহায়া বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তাদেরই উমেদার দেখা যেত; এখন চাকরী-যাওয়া ও মাইনে-কমা বাবুদের স্ত্রীরাও কিছু না কিছু উপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।—এমন কি, মাসিক দশ টাকার জোগাড় হ'লেও তাঁরা অনেকখানি তৃপ্ত হন। কিন্তু উপার্জ্জন করেন কোথায়?—ক্ষেত্র কই? কাগজের ঠোঙা বানানো, বিড়ি পাকানো, দোকানওয়ালাদের জন্য সুপুরি কেটে দেওয়া প্রভৃতি ছোটদের কাজ নিতে সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ঐ সকল কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে একান্ত ভাবে চান যদি কোন উচুদরের শিল্প সাহায্যে কিছু সংগ্রহ করতে পারেন। তাতে মান থাকে আত্মীয়কুটুম্বের কাছে। মানের দায়ে ঐ সকল কাজ তাঁরা লুকিয়ে করে' থাকেন। আমাদের কাছে চিঠি আসা ও লোক আনাগোনার অন্ত নেই। শিল্প সাহায্যে উপার্জ্জন

ছাড়া শিক্ষাকার্য্যে উপার্জ্জন করার সময়ও নেই তাঁদের, সামর্থ্যও নেই।' দেশের এই অবস্থার দিকে দেশবাসী নরনারী দৃষ্টিপাত করুন। সমিতি কেন্দ্রেই তাঁরা একত্র হ'য়ে একটুখানি পথ পেতে পারেন শিল্পচর্চ্চায়, কিন্তু স্থানীয় লোকের অর্থসাহায্যের অভাবে সমিতি চালানই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। গৃহস্থ লোক কি অভাবে পড়েছে বলার নয়। প্রত্যেক ছোট ছোট পাড়ার ধনী ও শিক্ষিতা মহিলারা এক একজন মাথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে এই গৃহস্থ পরিবারের পরিশ্রমী মেয়েদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। বাইরে অনেক চাঁদা দিতে হয়, তা না দিয়েও যদি তাঁরা নিজ নিজ পাড়াকে কেন্দ্র করে' কতকগুলি মেয়ের উপার্জ্জনের সহায়তা করতে পারেন, তাতে ধর্ম্ম, পুণ্য ও কর্ত্তব্য তিনিই একযোগে সাধন করা হবে। অনেকে কর্ছেন,—আরও অনেকের এ কাজে নাম্‌তে হবে। ধনী ও শিক্ষিতারা এই সকল ভদ্র দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হ'লে ও তাঁদের সহায়তা কর্‌তে পার্‌লে নিজেরা অনেকখানি সুখী হ'তে পার্‌বেন বলে' আমাদের বিশ্বাস এবং হৃদয় দিয়ে তাঁরাও তাঁদের প্রতিদান দেবেন অনেকখানি।

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ

বাংলার ইংরাজী-অনভিজ্ঞা ঘোরো মেয়েরা দুঃখ জানান, "ইংরেজী-জানা বিদেশ-ঘোরা মেয়েরা যেমন ব্যাপক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেশের কাজ করতে সমর্থ হন, আমরা তা পারি না। বিদেশী ধরণের সঙ্গে আমরা অপরিচিতা—ভাষা না জানায় বোঝাপড়াও করতে পারি না বিদেশী ব্যাপারের সঙ্গে ভালো করে'। দেশী ছাঁচে দেশের কাজ কর্‌তে পারি যদি পথ দেখাতে পারেন।"

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ করার দরকার আছে খুব বেশী, এ কথা তাঁদের জানাতে হবে। দেশী ছাঁচেই দেশের মানুষ গড়ে' উঠ্‌বে, বিদেশী ছাঁচে ঢালা দেশের ধাতে সইবে না পুরোপুরি,—সকলেই বুঝেছেন। অতএব দেশী মেয়েরা ফেলা নন দেশের কাজের ক্ষেত্রে। অবশ্য পৃথিবীর সঙ্গে যোগে চল্‌তে হ'লে নানা দেশের জ্ঞান ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়াও দরকার বটে,—কিন্তু ছাঁচ বদল হবে না একেবারে তাই বলে'। দেশের চিড়ে-মুড়ির আদর যাবে না কোন কালে বিদেশী বিস্কুট পেলেও। গরুর খাঁটি দুধটুকু প্রাণ বাঁচাবে চিরকাল—বিদেশী টিনের-দুধ এসে তার জায়গা দখল কর্‌তে পার্‌বে না কোনমতে। দেশের সোনামুগের দাল ও সরু চালের ভাতেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ কর্‌বে সহজে স্বল্প-ব্যয়ে—বিদেশী হর্‌লিক্‌স্‌ ও ছ'মাস ধরে' টিনে পোরা ব্যয়সাধ্য পেটেণ্ট খাদ্যে অভাব ঘুচবে না দেশের মানুষের। দেশের খাঁটি জিনিষগুলি বাঁচাতে পারা ও সেগুলিকে উপাদেয় করে' তোলার ভার দেশের মেয়েদের হাতে। এটি বড় কম কাজ নয় দেশের মেয়েদের পক্ষে। ব্যাপক ক্ষেত্রের দিকে না তাকিয়ে পরিবার ও পাড়াটির প্রতি দৃষ্টি ফেলুন দেশের মেয়েরা। নিজ নিজ পরিবার ও পাড়াকে স্বাবলম্বী করে' তুলুন বহু-ব্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে'। সদ্ভাব রক্ষা করে' মিল্‌তে শিখুন পরস্পরের মধ্যে ও এই ভাবে দেশের মেয়েরা স্বরাজ আনুন স্বঘরে।

লক্ষ্মীকেন্দ্র

কলিকাতার বাজারে আজকাল হরেকরকম নূতন নমুনার মিলের সাড়ী আমদানি হয়েছে। দাম শান্তিপুরে, ঢাকাই সাড়ীর তুলনায় যথেষ্ট কম, অথচ দেখতে তাদের চেয়ে কম সুন্দর নয়। হাতে-বহরে

বেশ বড়—প্রত্যেকটি বারোহাতি। গৃহস্থ ঘরের বৌঝিদের স্বল্পব্যয়ে সাধ মেটাবার সুযোগ ঘটেছে দেখে আমরা আনন্দ পাচ্ছি। ধনী ঘরের বৌঝিদের ঐ সকল কাপড় পরে' ঘরের বাইরে নানা স্থানে যাতায়াত করতে দেখছি। ধনী-গৃহস্থ সমান পোষাকে বাইরে দেখা দিচ্ছেন, এ আর একটি আনন্দের বিষয়। মানুষ যতই পরস্পর সমান হ'য়ে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীর ততই মঙ্গল। কেবল মনটা ব্যথিত হয় দেখে যে ঐ সকল কাপড়ের দোকানদাররা কেউ পার্শী, কেউ গুজরাটী, কেউ মাড়োয়ারী ইত্যাদি,—বাঙালী দেখা যায় না প্রায়ই। মনে হয়, বাঙালীদের ভয় আছে ব্যবসায়ে নাম্‌তে। ব্যবসায় ব্যাপারটি জাতির লক্ষ্মীকেন্দ্র; এই কেন্দ্রটি পুষ্ট না থাকলে জাতি জীর্ণ হ'য়ে পড়বেই। বাঙালীর ব্যাবসায়বুদ্ধি কম আছে বলে' আমাদের মনে হয় না, ব্যবসায় ব্যাপারে অহরহ মনোনিবেশ করা তাদের স্বভাবের পক্ষে কষ্টকর বলে' আমাদের বিশ্বাস। বাঙালী দু'এক ঘর বড় ব্যবসাদার যাঁরা আছেন তাঁরা যদি নিজেদের ব্যবসায়কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবসা শেখাবার জন্য কোন ট্রেনিং স্কুল খোলেন তাতে দেশের কতক মানুষ ব্যবসায়-ব্যাপারে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তা হ'লে ব্যবসায়ের আতঙ্কটাও তাদের কমে' যেতে পারে কতক পরিমাণে। অনেক বাঙালী মেয়ের বিষয়বুদ্ধি খুব প্রখর; তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করে' কিছুটা ভার তাঁদের উপর রেখে পরিবারের পুরুষরা ব্যবসায় ফাঁদ্‌লে হয় ত লোকসানের দায়ে না পড়্‌তেও পারেন। কয়েকজন ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েকে স্বামীর ব্যবসায়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সেক্ষেত্রে সাফল্যও ঘটেছে ভালো রকম। ঘরে ঘরে এ বিষয় আলোচনা করে' দেখা দরকার। চারিদিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখা ভালো। বাংলার প্রতি পরিবারকেন্দ্রে লক্ষ্মী এসে অধিষ্ঠান করুন, এই চাই।

চাঁদার চাপ

এক নিমন্ত্রণ-সভায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা, পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। কথায় কথায় পরিচিত হ'য়ে তিনি দেশের কাজের কথা পাড়লেন। বল্‌লেন—"আজকাল অনেক মেয়ে দেশের কাজে নেমেছেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করে' বারম্বার তাঁরা চাঁদা চান। না দিলেও লজ্জা করে, দিতেও পেরে উঠি না সব সময়।" মানুষটি দেখ্‌লুম বেশ সরল, সহজ ও অমায়িক। মহিলাটি বয়স্কা বিধবা—একটু সেকেলে ধরণের। অল্প পরিচয়ে মনের কথা ব'লে ফেল্‌লেন খোলসা। একটু ভেবে বল্‌লুম,—"যা আপনি পারবেন তা'ই দেবেন, লজ্জার দায়ে ঠেকে দিতে হ'লে কষ্ট পাবেন সেটা ভালো নয়। কিছু দেবার সামর্থ্য আপনার আছে কি?" তিনি বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, কিছু আমি দিতে পারি, অবস্থা আমার খারাপ নয়। তবে দশজনকে দশ ভাগে দিতে গেলে অবস্থায় কুলায় না।" বল্‌লুম—"কাজের খবর নিয়ে যে কাজে আপনার প্রীতি সেই কাজে দেবেন—সর্ব্বত্র না'ই দিলেন।" বল্লেন,—"মুস্কিল ঐখানে; যিনি চাইতে আসেন তাঁর মুখ চেয়ে দিতে হয়,—কাজের দিকে চাওয়া চলে না সে সময়। আর, দেশের কাজের ব্যাপারও আমি ভালো করে' সব বুঝ্‌তে পারি না—।"

এই সরল মহিলার কথাটা আমার মনে গিয়ে বাধ্‌ল। কাজটা ভালো করে না বুঝিয়ে ও দাতার মনের সঙ্গে মিল না খাইয়ে চাঁদা আদায় করাটা ভালো নয়, বুঝ্‌লুম। তিনি আরও বল্‌লেন,—"একটা কাজ ভালো ক'রে বুঝে যদি তাতে দি তবে সহজে দশ টাকা দিতে পারি; কাজটারও তাতে অনেকখানি সুবিধা হয়। না বুঝে এক টাকা ক'রে দশ জায়গায় দশ টাকা দেওয়া আমার নিষ্ফল বোধ হয়।"

বুঝ্‌লুম, রুচিভেদে মানুষের কার্য্যভেদ হওয়া উচিত। আরো

বুঝ্‌লুম, না বুঝে দান মানুষের মনের বোঝা বাড়ায়; সোজা মনকে ক্রমে বাঁকিয়ে তোলে; গৃহাগত অতিথিকে ছেঁদো কথায় ফেরাবার কলাকৌশল শেখায়।—এটা ভালো নয়।

সাহিত্যিক দলের শুভ প্রচেষ্টা

কলিকাতা সহরের স্থানে স্থানে সাহিত্যিক দলের বৈঠক বসে প্রায় প্রতি সপ্তাহে। তরুণ সাহিত্যিক দল সেখানে নিজেদের মধ্যে সাহিত্যালোচনা ক'রে থাকেন মন খুলে। কয়েক মাস অন্তর অন্তর বৈঠকগুলির একটি ক'রে বিশেষ অধিবেশন হয়। কোন একটি সঙ্ঘের এমনতর একটি বিশেষ অধিবেশনে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। যাব-না-যাব দ্বিধা ছিল মনে—তরুণদের মধ্যে যাওয়াটা হয় ত বেখাপ হবে ব'লে। কি জানি তাদের মনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারব কি না এই বয়সে। ছাড় পেলুম না কোন মতে। পরিচিত দু'একটি অগ্রণী ছেলে একান্ত আগ্রহে ধ'রে নিয়ে গেল দাবী ক'রে। যেতে হ'ল। কয়েকটি মহিলা সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেখি, সভার ঘরটি ভ'রে গেলে ছেলের দলে। ঘরটি খুব বড় না হ'লেও মোটেই ছোট নয়। সবাই যেন অপেক্ষা ক'রে আছে নূতন মানুষের জন্ত। যেন ভাব্‌ছে—কে জানে তাদের আজকের সভাটি কেমনতর বা হয়। সভারম্ভে গান, পরে কবিতা ও প্রবন্ধপাঠ শেষে সুপ্রসিদ্ধা সাহিত্যসেবিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্প পড়া। আরও একটি ছোট গল্প পড়ার পরে সভা হ'ল শেষ। দু'টো কথা বল্‌তে হ'ল আমাকেও। ফেরার আগে ছেলেদের মুখে দু'চারটা কথা শুনে কৃতার্থ হ'য়ে ফিরেছি। একজন অগ্রণী হ'য়ে বল্‌লেন, "আপনাকে এর মধ্যে আনা আমাদের সাহিত্যচর্চ্চাটা বিপথে পরিচালিত না হয়, তার জন্তে। সাহিত্যে সাম্‌লে চল্‌তে শিখ্‌ব আপনি থাক্‌লে।" পরে

আন্তরিকতায় ভরা আরো যা দু'পাঁচটা কথা শুনলুম তাতে বুঝলুম, বাঙালী সন্তান এখনো নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। সুপণ্ডিত পুত্র মূর্খ মাতাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে পারে আজও এই বাঙলায়।

কুরুচির খোঁজ পেলুম না এদের এখানে লুকানো কোন কোণেও—আমার সৌভাগ্য!

সমাজ-সেবায় নারীর উদ্যোগ

এক মহিলা সমিতিতে যেতে হ'ল। সভায় জড় হয়েছিলেন মেয়ে কিছু কম নয়। চেয়ারগুলি ভ'রে গিয়ে বড় বড় সতরঞ্চি পেতে বসাতে হোল অনেককে। কালেক্টর পত্নীর ডাকে এসেছেন সকলেই খুসী হয়ে, দেখলুম। এঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিতা দলের মেয়ে নন, আমাদের একান্ত আপনার জন, বাঙলার ঘরের মেয়ে। সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ, স্কুল কলেজের আবহাওয়ায় প্রায় কেহই মানুষ হন নাই—সকল কথা গুছিয়ে বলতে না জানলেও বুঝতে পারেন সব, ধরতে পারেন অনেক ভাব একটুখানি বুঝিয়ে দিলেই—দু'টো কথা বলতে গিয়েই সেটা বুঝতে পারা গেল স্পষ্ট। প্রথমে মুখে কথা ছিল না কারও, দু'চারটি প্রবন্ধ পাঠ ও কতকটা আলোচনা করার পরই সকলের প্রাণে সাড়া জেগে উঠলো,—মুখও খুললো দু'চার জনের। সকল রকম উন্নতিতে সকলেই উৎসাহ বোধ করেন দেখা গেল। তাঁদেরও প্রাণ খুলে যায় মানুষে মানুষে মিলতে পারলে। অ-ছোঁয়া জাতের কচি শিশুগুলিকে কোলে নিতে তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা আসে না, যদি জানেন তাতে অধর্ম্ম নাই। ছোট থেকে তাঁরা শুনে এসেছেন অ-ছোঁয়া জাতকে ছুঁলে জাত যায়, ধর্ম্মহানি হয়। মানুষের আত্মা ফেলবার নয়, হেলা করবার

নয়,—এই কথাটা তাঁরা পুনঃপুনঃ না শোনায়, মনটা জড়িয়ে পড়েছে উল্টা পথে। আমাদের সকলেরই মনে এই ধাঁধাঁ থেকে গেছে কিছু কমবেশী,—

"মানুষ ছুঁলে জাত যাবে না পাপকে ছুঁলেই সর্ব্বনাশ
পাপের ভারে ভরলে দেহ করতে হবে নরক বাস।"

ধূলো ঝেড়ে কাদা মুছে শুচি ক'রে মানুষকে তুলে নিতে হবে—ধর্ম্ম তাতে বড় হবে ছোট না হয়ে,—কথাটা তাঁরা বুঝলেন ধর্ম্মেরই নামে।

বিধবার শিক্ষা-সুযোগ

একদিন ছিল, যখন "বিধবার শিক্ষা" কথাটা শুনলেই পরিবারের লোক আঁৎকে উঠতো, লজ্জায় যেন তাদের মাথা কাটা যেতো। বিধবার পথে দাঁড়ানোর চেয়েও সেটা যেন অপমানের ব্যাপার। বেশী নয়, দশটি বছরের ভিতর বাংলায় এ সম্বন্ধে যুগান্তর ঘটেছে। বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন, হিরণ্ময়ী-বিধবা-শিল্পাশ্রম, সরোজনলিনী নারীশিক্ষালয় ও পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম দেশের মধ্যে মাথা তুলে উঠেছে! এ চারিটি প্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে বিধবাদের জন্য। এর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ অর্থকরী বিদ্যালাভ। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা। এই পর্য্যন্ত শিক্ষা আয়ত্ত হোলে কিছু না কিছু রোজগার করার সুবিধা ঘটে প্রত্যেক বিধবার—ট্রেণিং পড়তে যাওয়ারও পথ খোলসা হয় এই পর্য্যন্ত শিক্ষা এগোলে। অনাদৃত বৈধব্য-জীবনে এটা কম সুযোগ নয়। এ চার প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার ব্যবস্থা অনেকটা একরূপ, শিক্ষার শেষ-সীমাও প্রায় একই স্তরের।

ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে অভিভাবকদের দৃষ্টি খুব বেশী, কাজেই কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যয় কত কম তারই সন্ধানে তাঁরা ফেরেন, বিধবাদের জন্য ব্যয় করতে স্বভাবতঃই সকলের মন বিমুখ বলে'। মাসিক তিনটি টাকার

ব্যবস্থা করে' বিধবাকে কাশী পাঠিয়ে দিলে যখন চলে, তখন তার জন্য দশটাকা মাসে ব্যয় করে কে !

এতো গেল এক তরফা ; ওদিকে গায়ের গহনা খুলে' নিয়ে বিধবা বউকে বিপন্ন বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তো একান্ত আটপৌরে ব্যাপার অনেক পরিবারে। মেয়েকে ঘাড় পেতে নেন বটে বাপ মুখটি বুজে—কিন্তু দুশ্চিন্তার বোঝা বহেন রাত দিন মনে মনে,—একমাটির ওপড়ান গাছ পুনরায় সেই মাটিতে লাগবে কি না ভেবে। বিধবার এই দশাবিপর্য্যয়ের অকূলে কূল দেখিয়েছে এই চারিটি প্রতিষ্ঠান !

পুরী-আশ্রমে স্বল্পব্যয়ে কন্যাদের রাখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও তীর্থের আকর্ষণও আছে, তাই সেখানে কন্যা পাঠাতে অনেককে উৎসুক দেখা যাচ্ছে। সেখানে স্থান-সঙ্কোচ হলেও ছাত্রী বেশী পেলে স্থান বাড়াবার চেষ্টা করা হবে।

সমুদ্রতীরে দেবী বসন্তকুমারীর এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু বিধবার একটি পরম সুন্দর আশ্রয়। সেখানকার দু'একটি বিধবা ছাত্রী শিক্ষা শেষ করেও বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছুক। সেখানে থেকেই উপার্জ্জনের সুযোগ তারা খুঁজচে। জায়গাটি তাদের এতই ভাল লাগে। বিধবার জীবন সার্থক হোক, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক,—এই প্রার্থনা।

মাটির আদর

দেশের মানুষ কষ্ট পাচ্ছে নানা দিক থেকে, সবাই দেখচেন। গরীবের কষ্ট ছিল চিরকাল, কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্কট ধনী-দরিদ্র সকল ঘরকে নাড়া দিয়েচে খুব বেশী। এখন ভেবে দেখতে হবে, প্রকৃত সঙ্কটটা অর্থের না অন্নের।

'টাকা নাই—টাকা নাই' রবটা ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়। টাকার

দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশে দিন কাটালে জীবনযাত্রা সহজ হবার সম্ভাবনা আছে কি ? সহরতলীতে জমি জমা পাওয়া যায় সহরের তুলনায় জলের দরে। দুঃসময়ে এ সুযোগ হেলায় না হারিয়ে সেইদিকে সকলের চোখ ফেলা দরকার। "মাটি লক্ষ্মী"—কথাটা জানতে হবে সবাইকে। মাটির গুণে খাঁটি মাল উৎপন্ন করতে হবে দেশে যতটা সম্ভব। মেয়েদের এদিকে মন এগোনো চাই। সহুরে সুখের নেশা ত্যাগ করে' সুন্দর স্বচ্ছল গৃহস্থালী পাত্‌তে হবে তাঁদিকে সহরের আশপাশের সস্তা জমিতে। ভুঁই-ক্ষেতে হরেক রকমের ফসল ফলিয়ে তুলতে হবে অজস্র। আগে যেমন ধান চালের বদলে তেল নুন তরিতরকারী কবিরাজের ওষুধ ইত্যাদি পাওয়া যেত অনেক কিছু, বর্ত্তমানেও সেই পন্থা ধরতে হবে নূতন ভাবে নূতনতর শিক্ষার মধ্যদিয়ে। শিক্ষার গৌরব সহরে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়বে দেশের অনাদৃত মাটির বুকে,—সোনা ফলবে মাটির কোলে—অভাব ঘুচবে দেশের ও দশের।

শিক্ষিত মহিলারা অগ্রগামী হয়ে কেউ ঘরে বসান তাঁত—কেউ ঘানিতে ভাঙান তেল—কেউ মাখন তুলুন দুধের—কেউ ঘী করুন সরের। প্রতিবেশিনী গৃহিনীদের সঙ্গে বদল-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে' অভাব মেটান নিজের ঘরের। অশিক্ষিতা অর্দ্ধশিক্ষিতাদেরও সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগান যতটা পারেন।

দৈনিক সিধার ব্যবস্থা করে স্বল্প বেতনে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করুন সহরতলীর ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির জন্য। টাকা ছেড়ে বাঁচবার পথ বের করতে হবে তাঁদিকে সুবুদ্ধির সহায়তায়। অনেকেই একথাটা ভাবচেন, তাঁদেরই ভাবনাটাকে আরও এগিয়ে দিতে চাই। সাবেকী আমলের সব কিছু ছাড়লেও মাটি ছাড়লে চলবে কি ?

বাংলার বিধবা

বাঙলার সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলার সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের পরিচয় ঘটেছে। তাঁরা সকলেই বিধবা। স্কুল কলেজে পড়েন নাই তাঁরা কোন দিন কিন্তু শিক্ষা দিক্ষা বিচার বিবেচনা ও ত্যাগ-নিষ্ঠায় তাঁদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পেলে শ্রদ্ধায় মন নত হয়ে পড়ে একান্তভাবে। মনুষ্যত্বের দিক থেকে তাঁরা কতখানি উন্নত, ব্যবহারে না আসলে বোঝা যায় না সহজে। তাঁরা নিছক পর্দ্দানসীন্ নন, তবে সমাজে বাস করেন বলে' পারিবারিক আব্‌রুটুকু মেনে চলেন অনেকখানি। বাংলার উচ্চশ্রেণীর ভদ্রঘরে দেশীয় শিক্ষারীতি বা সংস্কৃতির যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারা চলে আসছে অনেকদিন থেকে, বর্ত্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে সেটি মার্জ্জিত হয়ে উঠেছে আজকাল নানাদিক থেকে সকলের মধ্যে। এঁরা তারি আওতায় মানুষ; গোড়া না উপড়ে ডালপালা ছেঁটে নূতন কাণ্ড ও পাতা গজাবার সুযোগ ঘটিয়ে দিলে যেমন ফলে ফুলে গাছ নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়, বর্ত্তমান সমাজক্ষেত্রে এঁদের জীবনটি মনে হল কতকটা সেই রকম। নূতন পুরাতনের সম্মিলিত ধাঁচায় এঁরা গড়ে উঠেছেন। অন্ধ সংস্কারের আঁকা বাঁকা বেড়া ভেঙ্গে এঁদের মন ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে—সমাজের গলদ এঁরা দেখতে পান খোলা চোখে সোজাসুজি—সেগুলে ছেড়ে চলার সৎসাহস এবং সামর্থ্যও রাখেন যথেষ্ট। অন্যদিকে সহিষ্ণুতার সদভ্যাস সইতে শিখিয়েছে এঁদের গোড়া থেকে সব রকম প্রকৃতির মানুষকে, তাই পর আপন হয়ে যায় দুদণ্ড কাছে এসে এঁদের প্রাণের পরিচয় পেলে, সহজে। এঁরা আমাদের দেশের মেয়ে দেশী শিক্ষায় শিক্ষিতা বাংলার বিধবা। দেশের সকল মেয়ের সঙ্গে এঁরা সম্মিলিত হ'ন, সুশিক্ষার অভাবে যারা মারা পড়ছে প্রতিদিন, প্রাণের খাদ্য

পরিবেশন করুন তাঁদের পাতে। সমাজের যে-স্তরে অতি আধুনিক শিক্ষিতারা প্রবেশ করতে পথ পাচ্ছেন না, সেই স্তরে এঁরা নিজের শিক্ষা দীক্ষা ঢেলে দিন, এই প্রার্থনা।

শাশুড়ীর মমতা

বাঙ্গালীর ঘরে বৌএর দোষ ধরা অধিকাংশ শাশুড়ীর একটা রোগ। শ'এর মধ্যে দু'একজন যদি তা থেকে বাদ পড়েন। বাদ পড়া শাশুড়ীদের একজনের কথা আজ লিখে সুখী হ'তে চাইছি।

শাশুড়ী শিল্প-শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী; সামান্য বেতন পান, নিজের খরচ চালান তাই দিয়ে। একমাত্র ছেলে উপার্জ্জনক্ষম হতে বিয়ে দিলেন সাধ করে', সংসার করে ছেলে সুখী হবে বলে। সকল সাধে বাদ সেধে বিধাতা তুলে নিলেন ছেলেটিকে; একমাত্র ছেলের একমাত্র বৌ বিধবা হয়ে শাশুড়ীর গলায় পড়লো চিরজন্মের মত। স্নেহশীলা শাশুড়ীর গলায় বালবিধবা বৌটি কাঁটা হয়ে না বিধে হার হয়ে ঝুললো মমতার গুণে। অধিক আশা না রেখে বৌকে দিলেন শাশুড়ী শিল্প শিক্ষালয়ে শিখতে। তিন বৎসরে সেখানকার শিল্প-বিদ্যাগুলি যথারীতি আয়ত্ত করে বৌ শিল্প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। সঙ্গে সঙ্গে ৭ম শ্রেণীর পড়াও হোল শেষ। টানাটানির সংসার তবু উপার্জ্জনের মায়া কাটিয়ে বেশী শেখার জন্যে শাশুড়ী বৌকে দিলেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে। বৌটি এবৎসর মেট্রিকে লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। শাশুড়ী এখনো বৌকে চাকরীতে না ঢুকিয়ে কলেজে দিয়েছেন পড়তে,—বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াবেন, সঙ্কল্প।

বেশী শিখে বৌ স্বাধীন হয়ে শাশুড়ীকে অগ্রাহ্য করবে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিজের খুসীতে দিন কাটাবে এমনতরটি ভাবা অল্পশিক্ষিতা শাশুড়ীর

পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু মমতাময়ী শাশুড়ী তা না ভেবে ছেলের শোক ভুলতে চাইছেন বৌকে মানুষ করে।

এক্ষেত্রে শাশুড়ীর স্নেহ অতুলনীয়। বাংলার বালবিধবা বৌ এখন এমন শাশুড়ীর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করে সকলদিকে তাঁকে সুখী করে মানুষ-সমাজে মনুষ্যত্ব ও বাঙ্গালী সমাজে উৎকৃষ্ট সামাজিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পরিবারের প্রতিষ্ঠা বাড়ান দেশের মধ্যে, তবেই বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হবে।

টুকরো কথা

ধনীর ঘরণী, উচ্চ ইংরাজ সমাজে সম্মানিতা, দেশী সম্ভ্রান্ত দলেও গণ্যমান্যা কোন বিশিষ্ট মহিলা কথাপ্রসঙ্গে একদিন বললেন "পৃথিবীর অন্য সভ্য জাতির কাছ থেকে সভ্যতার কোন নূতন অঙ্গ যদি আমাদিগকে গ্রহণ করতে হয় তবে স্বাস্থ্যলাভের জন্য চেঞ্জ করে আসার ভাবে সেটুকু গ্রহণ করতে হবে। যেমন গা-সওয়া জল-হাওয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করে শরীরে নূতন বল সঞ্চয়ে অক্ষম হ'লে তাকে নূতন জল-হাওয়া সংস্পর্শে এনে তাজা করে তুলতে হয়,—এও সেই রকম। ঘর ছেড়ে, বিদেশীর ঘরে ঘর বেঁধে নূতনতর বিদেশী হয়ে পৃথিবীর অঙ্গ থেকে নিজের ও পিতৃপুরুষের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে সুখ কি—বাহাদুরীই বা কোনখানে! অধিকন্তু বিদেশের জঙ্গলে আগাছা হয়ে বাড়তে থাকলে—সেখানকার সাজানো বাগানের লম্বা গাছটির গায়ে পরগাছা হয়ে ঝুলতে লাগলে বেঘোরে মারা পড়তে হবে একদিন। জঙ্গল তারা সাফ করবে, পরগাছাটি ছিঁড়ে ফেলবে অনাবশ্যক বোধে কোনো সময়ে—নিশ্চিন্ত।" কথা ক'টি কানে একটু নূতন ঠেকলো, অন্ততঃ তাঁর বলার ভঙ্গীটি বেশ একটু নূতনতর। ভাবলুম—কত মানুষ কত রকম করেই

ভাবে! উক্ত মহিলাটি ইউরোপে ঘুরে এসেছেন—বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত খুব ভাল করে'—দেশে ফিরেও বিদেশী সমাজ নিয়ে কারবার করছেন দিনরাত কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে দেশী সভ্যতার গোড়ার বাঁধনটুকু তাঁরা ধরে' আছেন শক্ত করে। সুনিয়ন্ত্রিত পরিবারটি তার সাক্ষী।

মহিলাটি স্বধর্মে নিষ্ঠাবতী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করে'ও সাধারণের প্রতি মমতাময়ী—আলাপটুকুও বেশ মিষ্টতা মাখান।

কুলিন-কুমারী

সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের দলটুকু ছাড়া বাকি লোকের খবর যাঁরা রাখেন না এবং গ্রামের খবর রাখেন আরো কম, তাঁরা জানেন না যে, বাঙলা দেশের অনেক গ্রামে এবং সহর অঞ্চলেও নামঢাকা অনেক পরিবারে, যাদের ঘরের খবর খবরের কাগজের এলাকার নয়—এখনো পাত্রের অভাবে কুলীন-কুমারীরা অবিবাহিতা থাকেন অনেক বয়স পর্য্যন্ত। কারো কারো সারা জীবনেও বর জোটে না। বিধবাদের জন্য পরিবারে যে শাসনবিধি আছে এদের সম্বন্ধে সেটুকু খাটানো চলে না—অথচ বেশী বয়সে কুমারী থাকার উপযোগী কোন শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও না থাকায় এঁদের জীবনটা আলগাভাবে চলতে থাকে—উদ্দেশ্যহীন হয়ে। মনের খোরাক চাই সকল মানুষের। স্বামী-সন্তান নিয়ে মেয়েদের মন ভরে থাকে অহরহ। নিঃসন্তান বিধবারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে দিন কাটায় কিন্তু কুলীন কুমারীরা করবে কি? বাপের বাড়ীতে তাদের ভয় থাকে কম, চাপ থাকে কম, কাজের ভার ঘাড়ে পড়ে না বৌদের মত তত বেশী, তাই পাড়া ঘোরে তারা প্রায় সারা দিন। আজকাল শেখার যুগে তাদেরও মনে শেখবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। ঐ ভাবের একটি বয়স্থা কুমারী নিজের চেষ্টায় মা-বাপের মত করিয়ে গ্রাম থেকে চলে এসে

কলিকাতায় আত্মীয়ের বাড়ী উঠেছে এবং তাঁদের স্নেহে সেখানে থাকার যোগাড় করে নিয়ে শিল্পশিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। নূতন শিক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে এসে প'ড়ে মন তার কতখানি আনন্দ পেয়েছে, দুদণ্ড কথা কইলে সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

শিল্প শিক্ষালয়ের 'ফ্রি-শিপ্'গুলি সাধারণতঃ বিধবাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে—দাতাদের দানই সেখানে সেই অভিপ্রায়ে। বয়স্থা কুমারীরা দুঃখ জানায়—দরিদ্র ঘরের অবিবাহিতা ও স্বামী-পরিত্যক্তা সধবাদের সহানুভূতির কেউ নাই। পরিবারের লোকেরাও মন দেয় না তাদের দিকে বেশী; সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চায় তারাও। নারীহিতকর নানা অনুষ্ঠানে এদের জন্যও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বর্ণগত সমিতির ফণ্ড

বর্ণগত সমাজের উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট সমিতির সৃষ্টি হয়েছে সম্প্রতি। সুবর্ণবণিক, সদ্গোপ, তন্তুবায়, যাদব, তাম্বুলী, বৈশ্যসাহা, ঝল্লমল্ল, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ, কায়স্থসভা প্রভৃতি সমিতিগুলি উল্লেখযোগ্য। এদের কাজ ভাল, উদ্দেশ্য ভাল, অনেক অবস্থাপন্ন শিক্ষিত লোকও আছেন এই সব দলের মধ্যে; নিজস্ব ফণ্ড ও আছে প্রায় প্রত্যেকটির। এরা পাঁচজন একমত হয়ে সমিতির ফণ্ড থেকে নিজ নিজ বর্ণের গরীব বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও বয়স্থা কুমারীদের বৃত্তি দিয়ে শেখার ব্যবস্থা করলে সমাজের গলগ্রহগুলির গতি করে সমাজকে অনেকটা ভারমুক্ত করা হয়। পাঁচজনে কাজ ভাগ করে নিলে সকল কাজই সহজ হয়, জানা কথা। এ সম্বন্ধে সমিতির সম্পাদক ও পরিচালক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অবুঝের বোঝা

সচরাচর মানুষ দুই রকমে কষ্ট পায়—অভাবে পড়ে ও স্বভাবের দোষে। সামান্য সাহায্যে অভাবের কষ্ট মেটানো যায় অনেকখানি; স্বভাবের কষ্ট ঘোচেনা সহজে। আজকাল দেশের অনেক মেয়ে নিতান্ত অল্প শিক্ষা সম্বল ক'রে চাকরীর উমেদারীতে বেরোয়। মুরুব্বি ধরে চাকরি যোগাড় করার জন্যে প্রাণপাত ক'রে ধন্না দেয় বড় লোকের বাড়ী—ফল পায় না প্রায়ই। শিক্ষার যুগে অল্পশিক্ষিত লোক নিতে চায় কে? এরা না জানে শিক্ষা দেওয়ার রীতি পদ্ধতি, না জানে চাকরী বজায় রাখার দায় পোয়াতে, অবুঝের মতো শুধু বলতে জানে—চাকরী না দিলে দাঁড়িয়ে মারা পড়বে খেতে না পেয়ে। এদের দুঃখে প্রাণ ফেটে যায় উপায় কিছু করা যায় না ব'লে। এরা দেশের মেয়ে, দেশবাসীর গায়ের রক্ত,—হেলার জিনিষ নয় মোটেই। এই সব অবুঝের বোঝা নামাতে হবে দেশের শিক্ষিত মানুষদিকে। চলনসই সাংসারিক জ্ঞানটুকুতেও এদের অনেকেই অনভিজ্ঞা, কুড়িটাকা মাহিনার চাকরির জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে বাড়ী বাড়ী, এদিকে বৃদ্ধ মা নিয়ে কলকাতায় বাসা করে রয়েছে ২০ টাকার অধিক ব্যয় ক'রে। কেউ বলে অন্নের উপর ব্যঞ্জন জোটে না এতটুকু, কিন্তু পান দোক্তার বদভ্যাসটা যা হয়ে গেছে তাতে ব্যয় পড়ে মাসে তিন টাকা। কেউ বলে এমন চায়ের অভ্যাস পেকে দাঁড়িয়েছে, সকালে উঠে দৈনিক দুটো পয়সা ব্যয় করা চাই-ই সে জন্যে। বেশীক্ষণ কথা বললে, বেশী করে খোঁজ নিলে বোঝা যায়, প্রকৃত অভাবের চেয়ে অবুঝপনার জন্যেই এরা দুঃখ পায় বেশী। পরিবার থেকে নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে পারে না কানা কড়ি, বিপন্ন হয়ে পরের দ্বারস্থ হয় প্রতি কথায়। এরা ফাঁকি পড়েছে কত দিক থেকে কে তার খবর রাখে? মা বাপ সাবধান হোন, ছেলে মেয়েদের সদভ্যাস ও সৎশিক্ষায়

মানুষ করে তুলুন, অল্পে চালাতে, অবস্থা বুঝতে, শ্রম স্বীকার করতে, দায়িত্ব নিতে ও স্বাবলম্বী হতে শেখান ছোট থেকে। বয়স্থারা যাতে বাইরের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা চালিত জ্ঞান লাভ করতে পারেন, তারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার বর্ত্তমান শিক্ষারীতির মধ্যদিয়ে।

অবুঝ পুরুষের সংখ্যাও দেশে নিতান্ত কম নয়।

সেবিকা-সদন

কলিকাতা সহরের আধুনিক ধনী-বসত্ অঞ্চলে অর্থাৎ সাহেবী পাড়ায় ঝি-চাকরের বেতন খুব বেশী। আট টাকা খাওয়ার কমে ঝি ও দশ টাকা খাওয়ার কমে চাকর ওসব অঞ্চলে মেলে না আদৌ। অনেক সময় তার চেয়ে ঢের বেশী দিতেও দেখা যায়। কচি শিশুর কাজ জানা ভালোরকম তৈরী আয়ার বেতন অনেক জায়গায় ষোল-আঠার থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে। এতটা রোজগার বড় কম কথা নয়। জমিদার বাবুদের সদর সেরেস্তার সরকার মুহুরী ও ছোটখাটো সওদাগরী আফিসের কেরাণীরা এর থেকে কম বেতন পায়। ঐ সব মোটা মাহিনার আয়ারা প্রায়ই কিন্তু পাহাড়ী, নেপালী, ভুটানী হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান হওয়ায় মিশনারী মেমদের তালিম পেয়ে অতটা কাজের লোক হ'য়ে উঠে। বাঙালী ঝিদের মধ্যেও অনেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী; তাদের শিশুপরিচর্য্যা ইত্যাদি শিখিয়ে তৈরী ক'রে নিতে পারলে ধনী বাঙালী ঘরে উঁচুদরের ঝিয়ের কাজ চালাতে পারবে তারা খুব ভালো করেই, আমাদের বিশ্বাস। বাঙলার ধনী-গৃহিণীরা উদ্যোগী হ'য়ে এদের শিক্ষার জন্য একটি 'সেবিকা-সদন' স্থাপন ক'রে যদি দলে দলে শিক্ষিত ঝি তৈরী ক'রে তুলেন, তবে তাঁদেরও সুবিধা হয়, জাতির দিক থেকেও একটা কল্যাণকর

ব্যবস্থা হ'তে পারে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর দুঃস্থাদের জন্য। অনেক ধনী মাড়োয়ারী পরিবারে খ্রীষ্টান আয়া রাখা চলে না ; তাঁদের গৃহিণীরাও এবিষয়ে মনোযোগ দিলে ভালো হয়। তাঁদের অর্থবলও আছে বেশী অনেকের চেয়ে ; মনে করলে তাঁরা সহজে দেশের মধ্যে একটা নূতন প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারেন।

পরিবারতন্ত্র

মানুষকে বাচতে হলে সকলের গোড়ায় যেমন তার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়, কোন জাত ও তার সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে তেমনি সকলের আগে তার ঘর সামলান দরকার। ঘর ভাঙলে নিজেরও আশ্রয় থাকে না, ছেলেমেয়েদেরও মানুষ করে তোলা যায় না— সকলকে মাঠে দাঁড়িয়ে মারা পড়তে হয়। তাই ঘর বাঁচানর চেষ্টায় আজ ঘরের কথার অবতারণা। বচনে আছে—

ঘরের গায়ে লাগলে আগুন
অসাবধানে জ্বলবে দ্বিগুণ।
মানতে হবে সবায় আজ
ঘর বাঁচানই আসল কাজ।

মানুষের চরিত্র গড়ে তোলা ও তাকে সভ্যতাসঙ্গত করে রাখার পক্ষে আমাদের দেশের পারিবারিক প্রথা বা পরিবারতন্ত্রের ব্যবস্থা মানব-সভ্যতার গোড়াঘেঁসা নানা কল্যাণকর বিধির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতর বিধি।

মানুষ একলা বড়ও নয়, মহৎও নয়, ভদ্রও নয়, সভ্যও নয়, শিক্ষিতও নয়। দশের যোগেই তার দাম, বহুজনের মিলন-চেষ্টাতেই তার চরিত্রের

বিকাশ, মহত্বের বৃদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার, সভ্যতার উৎকর্ষ ও মনুষ্যত্বের দাবী।

মানুষের দায় যিনি যতটা মেটাতে পারেন তিনি ততটা মানুষ হয়ে উঠেন। দায় এড়িয়ে বাঁচা মানুষের বাঁচা নয়, মানুষ জানে; তাই দশের দায়ে মাথা দিয়ে সে দশজনকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে—দিনের দায় মেটাবার জন্যে পথের মাঝে পরিবার গড়েছে।

বাঙালী নিজের সমাজ ও সভ্যতা মানুষের ঐ গোড়ার কথার উপর ভর করে গড়েছে—দিনের দায়গুলি তার দিনেদিনেই মিটিয়ে দিতে ঘরে ঘরে পরিবারতন্ত্র ফেঁদে, সকলের ভালোর দায় সে সকলের ঘাড়ে চাপিয়েছে। মানুষের একমেটে মোটা কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে উন্নত সূক্ষ্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিণত করে তোলার একটি মস্ত বড় আর্ট যে এর মূলে কাজ করছে সচরাচর সেটি সকলের চোখে ধরা পড়ে না।

পূর্ব্ব পুরুষেরা এই চিত্তস্পর্শী বহু দূরদর্শী ব্যবস্থায় হঠাৎ জলাঞ্জলি দিয়ে নিছক নূতন হয়ে ওঠার বুদ্ধি হয়ত সুবুদ্ধি নয়—ভেবে দেখার দরকার।

পরিবারতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক চিন্তাশীল ভদ্র বাঙালী মাত্রেই জানেন যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠি বা পরিবার একযোগে কতগুলি মানুষকে কতখানি সুসভ্য ও ভদ্র করে তুলে তাদি'কে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দেয়।

হাতে গোনা যায় এমন দু-একটি পরিবার হয়ত অত্যুগ্র সাহেবিয়ানার ফলে, পারিবারিক যোগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশীয় সমাজ ও সভ্যতা থেকে দূরে গিয়ে পড়েছেন; তাঁদের জীবন-যাত্রার ধারা সুবিধা অসুবিধার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও নূতনতর সভ্যতার সংমিশ্রণে নানা

পরিবর্ত্তন ঘটা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র বাঙালী এখনও যে পরিবারতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ও দেশীয় সভ্যতা থেকে ভ্রষ্ট হন নাই, এটি প্রত্যক্ষ।

অবশ্য সাবেকি আমলের একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন আর বেশী নাই—থাকা সম্ভবও নয়। নানা প্রয়োজনে পরিবারের নানা জনকে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তা ছাড়া একের অন্যের উপর অন্যায় চাপ ও অন্নের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে থাকার যে গুরুতর অনিষ্ট তা থেকেও পরিবারকে মুক্ত করা কর্ত্তব্য, এটা শিক্ষিত বাঙালী বুঝেছেন ও সেই পথ ধরে সবাই চলতে সুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারতন্ত্রে অনেকটা পরিবর্ত্তনও ঘটেছে এবং কিছুকাল হতে তার একটা নূতন গঠনও সুরু হয়েছে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কল্যাণময় বিধানকে স্বীকার করেই বর্ত্তমান গঠনের কাজ চল্‌ছে। নূতন পরিবারগুলি অনেকটা সেইভাবেই গড়ে উঠেছে। এই গঠনকার্য্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত এবং এটি যাতে প্রকৃত শুভকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যুগধর্ম্ম ও কালধর্ম্ম অনুসারে সমাজের যে সকল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, উন্নত বুদ্ধি ও জ্ঞান কালোপযোগী করে সমাজের মধ্যে যে সকল কল্যাণকর নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করেছে, সেগুলিকে নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েও এদেশীয় উৎকৃষ্ট সভ্যতার মূল কেন্দ্রস্বরূপ পারিবারিক প্রথাটিকে আমরা অনায়াসে বজায় রাখতে পারি।

পরিবারতন্ত্র সভ্যতা লোকব্যবহার, ভদ্রতা, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মবুদ্ধিচর্চ্চার একটি বিশিষ্ট শিক্ষালয়। ভদ্র বাঙালী ঘরের মেয়েরা ও পুরুষেরা এই শিক্ষালয়ে যথারীতি শিক্ষালাভ করে দেশীয় সভ্যতার ধারাটিকে অদ্যাবধি নিজের মধ্যে বহন করে আসছেন। এক একটি বাঙালী পরিবার এদেশীয় সভ্যতার এক একটি বিশিষ্ট

প্রতিমূর্ত্তি। যারা তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে আসে, তারা সেটি উপলব্ধি না করে পারে না।

বাড়ীর সরকার গোমস্তা ও পুরাতন ঝি-চাকরদের আত্মীয় সম্বোধনে ডাকা, মনিবগিরির অভিমান ঘুচিয়ে তাদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা বাঙলার বনিয়াদী ভদ্রবংশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একটি অঙ্গ।

বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠদের গুরুজনের মত সম্মান, ভূমিষ্ঠ প্রণাম, পদধূলি গ্রহণ—অবশ্য স্বজাতি হলে (স্কুল কলেজের ছেলেরা কিন্তু এ-বিষয়ে এখন আর বড় একটা জাতি-বিচার রাখছে না, ভিন্নবর্ণ হলেও পাঠগুরুর পদধূলি তারা ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করে) এ দেশীয় সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ।

অন্যের ভোজন-পরিতৃপ্তিতে নিজে পরিতৃপ্ত হওয়া বাঙালীজাতের সংস্কারগত সভ্যতার আর একটি লক্ষণ। ক্রিয়া-কর্ম্ম পালপার্ব্বণে দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্‌এর ইলাহি কারখানা, কাঙালী ভোজনের বিরাট আয়োজন, আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রণের ধুম যে বাঙলার চিরাচরিত প্রথা, তা কে না জানে, কে না দেখেছে? অবশ্য আড়ম্বর ও অপব্যয়ে এই সকল ব্যাপারে সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত ঘটে। সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সেটুকু বাদ দিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার সামঞ্জস্য বুদ্ধিতে এর আনন্দ অংশটি রক্ষা করলে খাঁটি বাঙালীত্বের রসটুকু বাঙালীর মনে জমে' দানা বেঁধে ওঠে। তা থেকে বাঙালী নিজেকে বঞ্চিত করবে কিসের আশায়, কোন সুখে।

সহুরে সাহেবী কায়দায় এ সবের মাত্রা সহর অঞ্চলে কিছু কমে এলেও সহরবাসী বনিয়াদী ভদ্রঘর ও পল্লীবাসী ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত সকল পরিবার এখনও মনের আনন্দে এ প্রথা সমভাবেই অনুসরণ করে থাকে।

নিজের হাতে রেঁধে, কাছে বসে খাওয়াতে না পারলে বাঙালী মেয়েদের অতৃপ্তির সীমা থাকে না। বাপ, ভাই, শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী, সন্তানরা তো আছেই, কিন্তু বিশেষভাবে জামাইবাবুরা এর সুখটা উপভোগ করেন।

বর্ত্তমান ভাঙাগড়ার যুগে, ভাঙনের ধাক্কা লেগে, নূতন গঠনের উপর্য্যুপরি প্রবেশের বেগে বাঙালীর এই সুখের আবাসে, আনন্দের মন্দিরে কিন্তু ভাঙন সুরু হয়েছে, তার পারিবারিক সম্বন্ধ-রক্ষার গোড়ার ভিত ঘেঁসে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে, ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসির চাপে তার পুরাতন জীর্ণ জায়গার কতক ধ্বসে পড়েছে। সকলে নূতন নূতন ঘর তৈরী করে নূতন পুরাতনের একত্র বসবাসের সুযোগ ঘটিয়ে নূতন জ্ঞানে তার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হোন্। বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তৃতির যুগে, অসংখ্য নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিজের বংশগত চির আচরিত পারিবারিক শিক্ষালয়টিকে সুন্দর করে উজ্জ্বল করে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত করে নূতন আকারে বাঙালী গড়ে তুলুন এই আবেদন নিয়েই আজ এ প্রবন্ধ তার সার্থকতা খুঁজছে।

যুগধর্ম্মের আতিশয্যে পরিবর্ত্তন স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও পারিবারিক সম্বন্ধবিশিষ্ট বাঙালীর সুন্দর সভ্যতাটি এখনও বাঙলা থেকে লুপ্ত হয় নি, বাঙালীর রক্তে এর ছাপ এখনও অস্পষ্ট হয়ে আসেনি, এ সৌভাগ্যটুকু বাঙালীর আছে স্বীকার করতে হবে।

পরিবারকে অস্বীকার করতে এখনও বাঙালী ভাল করে শেখেনি। পারিবারিক হীনতা এখনও তাকে দশের সামনে অপদস্থ অপমানিত করে—পরিবারের মর্য্যাদাহানিতে এখনও বাঙালী কাতর, সন্তপ্ত, ব্যথিত ও নতমস্তক হয়। অন্ধ বাপ-মাকে অন্ধাশ্রমে পাঠিয়ে তাঁদের সেবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে এখনও বাঙালী সন্তান সঙ্কোচে

শিউরে ওঠে, ধর্ম্মভয়ে সারা হয়। উচ্চতর সভ্যতার সেই উৎকৃষ্ট সংস্কার থেকে বাঙালী যেন কোন দিন ভ্রষ্ট না হয়।

পরিবারতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মেয়েরা অরক্ষিত, অসহায়, দুর্ব্বল হয়ে পড়েন, তাই কল্যাণবুদ্ধিসম্পন্না প্রত্যেক বাঙালী মেয়ে উচ্চশিক্ষিতা হয়েও পরিবারতন্ত্রেই নিজের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন। পুরুষ এই তন্ত্রের আশ্র.য় বাস করে যথেচ্ছাচার হতে বিরত থাকার সুযোগ পেয়ে শ্রী-যুক্ত হয়ে ওঠেন। তাই ভদ্র বাঙালী সন্তানরা দেশের এই চিরসুন্দর প্রথাটিকে প্রীতির সঙ্গেই পালন করেন—উন্নতমনা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা হয়েও।

মনুষ্যত্বের যে গুরুতর স্খলনে পরিবারতন্ত্র সত্যসত্যই নষ্ট হয়, ভেঙে পড়ে, পারিবারিক ঐক্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে কেবল সেই দোষটুকুই সকলে পরিহার করুন। পরনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা, পরধনলুব্ধতা, পরাশ্রয়মুগ্ধতা মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যত্বহীন জড়বৎ ক'রে ফেলে, একথা ধ্রুব সত্য। মনুষ্যত্বের এই অপরাধ থেকে সকলে মুক্ত হোন্। একই তন্ত্রের মধ্যে বাস করে স্বামী, স্ত্রী, ভাইবোন ছেলেমেয়ে সকলে স্বাবলম্বী হোন্। মেয়েদের উপার্জ্জনকে অসম্মানের মনে না ক'রে সম্মানের বিষয় মনে করুন। সকলে উপার্জ্জনক্ষম হলে সংসারযাত্রা সহজে স্বচ্ছল হয় এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়লে দূরতর আত্মীয়ের কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে হয় না। স্বচ্ছলতা ছাড়া সাংসারিক জীবন দুঃসহ, দুর্ব্বহ এবং অশেষ প্রকারে গ্লানিজনক হয়, ইহা সকলেই জানেন। গৃহকর্ম্মের মধ্যে থেকে নারী কি ভাবে উপার্জ্জনক্ষম হবেন সে ভাবনা নারীকেই ভাবতে দিন—তাঁরা নিজেই পথ করে নেবেন।

অধিকতর ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ যুবকরা আজকাল বিবাহ করতে

ভয় পায় সংসার চালিয়ে উঠতে পারবে না ভেবে। তারা যদি সুস্থ, সবল, অনলস, কর্ম্মপটু, উপার্জ্জনক্ষম পাত্রী পায়, তবে বিবাহ করে সুখে ঘর-সংসার করতে পারে। গৃহস্থ বাপ-মাদের এইভাবে কন্যাকে তৈরী করে তোলা দরকার। সামান্য হাজার দেড়হাজার পণ না নিয়ে একালের ছেলেরা যে ঐ রকম পাত্রীই বেশী পছন্দ করবে, তাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ পাত্রীর দর যে হাজার দেড়হাজারের চেয়ে অনেক বেশী, বুদ্ধিমান্ ছেলেমাত্রেই তা বুঝে। বাপ-মারা মুক্ত ও উদার হৃদয়ে ছেলেকে মনের মত ঐরূপ উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচনের সুযোগ দিন। অক্ষমতার অচল বোঝা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে, বাপ-মা হ'য়ে পণের লোভে ছেলের প্রাণান্তের যোগাড় না করাই ভাল।

স্ত্রী রান্নাঘরে বসে অন্ন পাক করেন, স্বামী বাহির থেকে অন্ন সংগ্রহ করে আনেন, এই জিনিষটি দেখতে যেমন সুন্দর ভাবতেও তেমনি সুসঙ্গত, শুনতেও তেমনি সুমধুর; কিন্তু স্বামীর অভাবে, প্রয়োজন হলে অন্যের ঘরে অন্ন পাক করে স্ত্রী উদরান্ন যোগাবেন—এ কথাটা স্বামীর কানে হয়ত তেমন শ্রুতিমধুর নয়। তাই একালের স্বামীরা শুধু স্ত্রীর হাতের রসাল অন্নব্যঞ্জনাদির রসাস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হন না, স্ত্রীকে আরো নানা উন্নত বিদ্যায় পারদর্শী দেখে পরিণামে নিশ্চিন্ততা খোঁজেন। এটি তাঁদের ভ্রান্তমতি বা ভ্রমান্ধবুদ্ধির পরিচয়?

পারিবারিক উন্নতি সঙ্কল্প করে স্বামী-স্ত্রী যখন সমচিন্তার সহযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের দৃঢ়নিষ্ঠ সত্য সঙ্কল্পপ্রেম হিমালয়ের অচল শিখরে আশ্রয় লাভ করে, হর-পার্ব্বতীর মিলন-সংভোগে সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। ধনী দরিদ্র সকল ঘরে শত মূর্ত্তিতে এ চিত্র ফুটে উঠলে দেশের কল্যাণ খুঁজতে কোথাও আর যেতে হবে না।

নিজ দেশের সভ্যতা থেকে বিচলিত না হয়ে পৃথিবীর জ্ঞানে সমুজ্জ্বল ও মনুষ্যত্বে অটল প্রত্যেক বাঙালী পরিবার এই নূতন সংগঠনে গড়ে উঠবে, অর্থগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পরিবারগত ঐক্যবোধ সকলের অন্তরে জাগ্রত থাকবে, ধনী ভাইপো দরিদ্র খুড়া জ্যেঠার পদধূলি সভক্তি ও সমাদরে গ্রহণ করবে, ছেলেমেয়ের বিবাহাদি পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ধনি গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী দরিদ্র প্রতিবেশীর দারস্থ হয়ে তাকে সাদর নিমন্ত্রণে গৃহে এনে যথেষ্ট সমাদরে তার পরিচর্য্যা করবেন, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সকলের অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে বাঙলার বাঙালী সভ্যতা অটুট থাকবে, এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা অথবা নিছক কল্পনা।

পিতৃপিতামহের পরিচয় দিয়ে তাঁদের চেনাতে না পারলে দশের সামনে যেমন মানুষকে অপদস্থ হতে হয়, পৃথিবীর সামনে নিজের সভ্যতাকে চিহ্নিত করে না দাঁড় করাতে পারলে বাঙালীকে তেমনি অপদস্থ হতে হবে এ কথা কি সত্য নয়?

আপনার ঘর সামালিয়া চল
বাঁচাও ঘরের যে-কটি প্রাণ,
অনশন আর অসম্মানের
বোঝা বয়ে কেহ লভে কি ত্রাণ?

সমিতির দুর্য্যোগ

সহর অঞ্চলে যে জিনিষ যতটা চোখে না পড়ে, সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে এক পা বাড়ালেই সুস্পষ্ট মুর্ত্তিতে সেগুলি ধরা পড়ে যায়। অদূরবর্ত্তী গ্রামে ঢুকলেই চোখে ঠেকে মানুষ দল বেঁধে পথে চলছে না, অনেকগুলি মানুষ একত্র বসতেও আতঙ্কিত হচ্ছে। এ অবস্থায় মেয়েদের

সমিতিতে জড় হতে পারা আরোই বিঘ্নসঙ্কুল। বাড়ীর বাবুরাও ভয় পান—মেয়েদের বলেন, তোমাদের দল বেঁধে কোথাও গিয়ে জুটতে হবে না। যেমন আছ থাক বাপু চুপচাপ ঘরের কোণে। দেশকাল খারাপ। সন্ধ্যায় বেড়াতে নিয়ে যাব বরং ফাঁকা জায়গায়, সেটা অনেকটা সহজ আছে—কাজ নেই সমিতির বালাইয়ে।" এমনতর বাধা ঠেলেও মেয়েরা আঁকুবাঁকু কর্‌ছে সমিতিতে গিয়ে কিছু শেখ্‌বার জন্যে। এক জায়গায় দেখ্‌লুম—পনের টাকা বেতনে একটি দর্জ্জি রেখে সমিতির কল্যাণে কাটছাঁট শিখ্‌ছেন মাথা পিছু দু'আনা চাঁদা দিয়ে।—সুন্দর ব্যবস্থা, গৃহস্থ মেয়েদের সুন্দর সুযোগ। বিপত্তির সময় বাধা ঠেলে এগোতে হবে,—উপায় নাই। অর্থসমস্যায় দেশ হাহাকার কর্‌ছে। মেয়েরা পরিশ্রমে দু'পাঁচ টাকা যা বাঁচাতে পারে তা'ই কম লাভ নয় এখনকার দিনে। চোখে দেখেছি, একটি মেয়ে কারো কাছে না শিখেও তৈরি জামার মাপ মিলিয়ে জামা ফ্রক ইত্যাদি তৈরি করে' মাসে ১৫।১৬ টাকা উপার্জ্জন কর্‌ছে অনায়াসে। দুপুরবেলা রাস্তায় যখন মানুষ চলে কম, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে তৈরি জামা বেচে আসে। নিজে কাঁচা সাবু ভিজানো খেয়ে দিন কাটায়—খরচ বেশী নাই; এতেই সে বেশ স্বাবলম্বী। বুদ্ধি খাটাতে শিখ্‌লে খুব অল্পেও অনেক কিছু করা যায়। এই বিষম দুর্দ্দিনে সেই পথই আমাদের ধরতে হবে।

সমিতিতে কুমারীর ভীড়

নিজ কলিকাতার আশপাশের সহরতলীগুলিতে সমিতি ফাঁদ্‌তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে দলে দলে কুমারী মেয়ে এসে সমিতিতে ভর্ত্তি হ'তে চায়। এরা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছে। এখন কিঞ্চিৎ উচ্চশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার তাদের প্রয়োজন। বাড়ীর অভিভাবকরাও

ঐটুকুর জন্য সমিতিতে কুমারী মেয়ে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে খুব ব্যগ্র। সমিতির কাজটি প্রথম সুরু হয় বিধবা ও অন্তঃপুরের বৌদের শেখানর উদ্দেশ্যে। তাঁদের দলে এখন কুমারীদের ভিড় দেখে মনে হয় সমিতি অন্তঃপুরশিক্ষালয়ে পরিণত হ'তে চলেছে। সহরতলীর কুমারী মেয়েদের কলিকাতার শিক্ষালয়ে বাসে যাতায়াত আদৌ সম্ভবপর নয়। কাজেই পাড়ায় পাড়ায় সমিতি-কেন্দ্রে শিখ্‌তে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় কি? কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে শেখা তাদের পক্ষে আরও অসম্ভব। গৃহস্থের তত টাকা সঙ্কুলান হয় কোথা থেকে? সম্প্রতি এক সমিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে সেটি যে এই ভাবের একটি অন্তঃপুরশিক্ষালয় গড়ে' উঠ্‌ছে, চোখে দেখে এলুম। যখন প্রয়োজন আছে তখন এরূপ শিক্ষালয়কে সমিতির অন্তর্গত ক'রে নিতে হবে।

সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় মেয়েদের ঝোঁক

সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় মেয়েদের ঝোঁক চিরকাল। আলপনা দেওয়া, ছিরিগড়া, পট আঁকা, পিঁড়ে চিত্তির, শিকে বোনা, কাঁথার নক্সা প্রভৃতি কারুকার্য্য-গুলি বাংলার মেয়েদের হাতের নক্সা। আজ তাঁদের সেই সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ধারাটি অতিরিক্ত পরিমাণে নিজেদের দৈহিক প্রসাধন ব্যাপারে নিয়োজিত হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। অনেক শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোককে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষারীতি ও চালচলনের গুণাগুণ নিয়ে পথে ঘাটে আলোচনা করতে ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চার ঘাড়ে তার দোষের ভাগটুকু চাপাতে দেখা যায় প্রায়ই। তাঁরা অধিকাংশ প্রবীন বয়স্ক—ছেলেমেয়ের বাপ, কাজেই কথাটায় তাঁদের কান না দিয়ে থাকা যায় না। কথাগুলি শিক্ষাবিরোধী দলের নয়,—যাঁরা শিক্ষা চান তাঁদেরই। তাঁরা বলেন,—মেয়েরা যত পারে শিখুক, দেশের কাজ

করুক, দরকার হলে চাকরী করুক, লাঠি খেলুক, ঘোড়ায় চড়ুক, পারলে বিলাত যাক, পার্লামেণ্টে বসুক, আপত্তি নেই, কেবল যদি সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় বাড়াবাড়িটা না করে, তাহলেই বাঁচা যায়।

এটা নিয়ে তাঁদের নাকি আজকাল বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে খুব বেশী—ঘর সামলান যাচ্ছে না কোন রকমে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা বলেন, চোখে কাজল প'রা পিঠে বেণী ঝুলান বড় বড় মেয়েরা চটিজুতা চট্‌চটিয়ে ট্রামে বাসে যাতায়াত করে—চোখে সেটা ঠেকে কেমন! বল্লে বলে—এটা কোনই দোষের নয়; সৌন্দর্য্য চর্চ্চা উন্নত সভ্যতার লক্ষণ; আরো পাঁচটা দৃষ্টান্ত তাঁরা দেখান, যেগুলো আলোচনা করতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। কথা শুনে মনে আঘাত লাগে। মেয়েদের সম্বন্ধে এমনতর আলোচনা শুনতে কষ্ট হয়। পথে পাঁচ রকমের মেয়ে চলাফেরা করে। সাজপোষাকে এক হলে হঠাৎ চোখ ফেলেই ধরা শক্ত, কারা কোন শ্রেণীর। একের দায় অন্যদের ঘাড়ে চাপাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, বিষয়টা গোলমেলে।

সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় মন ও রুচি সুন্দর হয়। সুন্দর মনরুচির মানুষ যেকোন কাজ করে তার প্রত্যেকটি শ্রীসম্পন্ন ও সৌষ্ঠবযুক্ত হয়—কাজেই সৌন্দর্য্য চর্চ্চা বন্ধ করা সম্ভব হয় কি করে! ভদ্রঘরে এতে যেখানে বিপদ ঘটে, পরিবারের বাঁধন সেখানে আলগা বুঝতে হবে। মেয়ে সামলাবেন মেয়ের বাপ, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার উপর চাপ কেন! যে-পরিবারে গোড়া থেকে ছেলেমেয়ের মনে ভদ্রতাজ্ঞান ও পারিবারিক সম্ভ্রমবোধ সুস্পষ্ট করে জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং বাপ মা নিজে সেই আদর্শে চলেন সে-পরিবারের অকল্যাণ ঘটতে দেখা যায় না প্রায়ই।

মানুষ একপেশে জীব নয় যে শুধু পাখী হয়ে উড়েই সুখ পাবে কিম্বা ছাগল হয়ে ঘাস চিবিয়ে শুধু জিবের স্বাদ্ মেটালে ও পেটটি ভরালে তৃপ্ত

হবে। বিচিত্র গুণশক্তির সমন্বয়ে মানুষের আনন্দমূর্ত্তিটি ফোটে। তার সৌন্দর্য্যবোধ যেমন স্বাভাবিক মঙ্গলবোধও তেমনি স্বাভাবিক, দুইএর সমন্বয়ে একটি আস্ত মানুষ।

বাংলার একজন খ্যাতনামা প্রবীণ বিচক্ষণ ভদ্রলোককে বলতে শুনেছি, যে-পরিবারে পুরুষের পৌরুষ ও মেয়েদের কল্যাণবোধ নেই সে-পরিবার আলগা হয়ে এলিয়ে পড়বে সহরের সদর রাস্তায়, শ্রীহীন হয়ে দেখা দেবে দশের মাঝে—ঠেকাবে কে। কথাটা ভেবে দেখা দরকার। যে যার ঘর সামলালে বিপদ ঘটবে কার? অনুযোগ অভিযোগের পালা শেষ করে ভদ্রলোকেরা সতর্কদৃষ্টিতে নিজ নিজ পরিবার গড়ার দিকে নজর রাখুন বেশী করে। পথে ঘাটে ঘরের মেয়েদের কথা এভাবে আলোচনা হওয়াটা শোভন কি?

মহারাণী সুনীতি দেবী

ভক্ত কেশবচন্দ্রের সেই প্রিয় কন্যা স্বনামধন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী।

নূতন যুগের প্রায় সব রকম নূতনত্বের সমন্বয় ঘটে ছিল সুনীতি দেবীর জীবনে, বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে প্রথম তিনি 'মহারাণী' হন দেশীয় একটা রাজ্যের। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সমগ্র ইতিহাসটি যাঁর জীবনের পাতায় পাতায় লেখা আছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার ধর্ম্মকে তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, আদর আপ্যায়ন সমাদরে পরিতুষ্ট করতে পারতেন তিনি বহু লোককে একসঙ্গে একই সময়ে। উপাসনার শক্তি, বাগ্মীতা, কথকতা প্রভৃতিতে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

এই দানশীলা মহারাণী সুনীতি দেবীর পুণ্যকীর্ত্তি, নারীকল্যাণ-

প্রচেষ্টার উজ্জ্বল নিদর্শন, দার্জ্জিলংএ "মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়" ও কলিকাতার "ভিক্টোরিয়া স্কুল" জেগে থাকবে দেশের বুকে চিরদিন তাঁর স্মৃতি নিয়ে।

স্বর্গীয়া ডাঃ কুমারী যামিনী সেন

বাংলার সুকন্যা, জাতির গৌরবস্থানীয়া খ্যাতনামা ডাঃ কুমারী যামিনী সেন গত ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ৬টায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের মোটা ঘটনাগুলি দৈনিক সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। আমরাও সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ক'রে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত থেকে তাঁর চরিত্রগত মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি কর্‌বার সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় দিয়ে সেই স্বর্গগতা ভগ্নীর আত্মার উদ্দেশ্যে আজ শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ ক'রে পরিতৃপ্ত হচ্ছি।

কুমারী যামিনী সেন জীবনে অর্থোপার্জ্জন করেছেন ঢের। উপার্জ্জনের প্রত্যেক পয়সাটি তিনি সদ্ব্যয় ক'রে গেছেন নিজের হাতে,—এটি কম শ্লাঘার কথা নয়।

যাঁরা স্বভাবতই সৎ, উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলে দেশে, কালে ও ঘরেবাইরে তাঁরা যে কতখানি সুফল ফলাতে পারেন, কুমারী যামিনী সেনের জীবন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙালী ঘরে পারিবারিক সুদৃষ্টান্ত ও সৎশিক্ষার সু-ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখে তার আশপাশের অন্যায় চাপকে ভেঙে ফেলে যাঁরা যথার্থ কল্যাণের মধ্যে নিজেদের মুক্তিদান কর্‌তে পারেন, বর্ত্তমান বাংলার নূতন গঠনে তাঁরাই জাতির অগ্রদূত। নারী-সমাজের সেইসকল অগ্রগণ্যাদের মধ্যে কুমারী যামিনী সেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজন্ম সন্ন্যাসিনীস্বভাবা পবিত্র-চরিত্রা এই

চিরকুমারী বাঙালী কন্যা পিতৃপরিবারের যেমন অশেষ কল্যাণকারিণী ছিলেন, পরিবারের বাইরে অনাথ বালক-বালিকাদেরও ছিলেন তেমনি তিনি সাক্ষাৎ জননী।

এই দুই স্থানে তাঁর কল্যাণমূর্ত্তি আমাদের চোখে-দেখা জিনিষ—কানে-শোনা শুধু একটা কথা মাত্র নয়। বর্ত্তমান শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে তিনি আলোকস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করুন, এই প্রার্থনা।

বাঙ্গলার স্যর রাজেন্দ্রনাথ

দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলেই, কিন্তু সেটা পায় ক'জন মানুষে? বিশেষতঃ বাঙালী। ছোট থেকে বাঙালী ছেলেমেয়েদের মন শুনে শুনে দমে থাকে,—বাঙালী অল্পায়ু। ষাট বৎসর পার হ'লেই তার "সময় হয়েছে" সাধারণতঃ সকল বাঙালীর এইরূপ ধারণা। বাংলার এই আয়ু-সঙ্কটে দীর্ঘায়ু বাঙালী দেখলেই আমাদের বুক বেড়ে ওঠে অনেকখানি। আশী পার হয়েছেন এমন বাঙালীর সংখ্যা কম। যে ক'জনা গুণে পাওয়া যায় তাঁরা জাতির অতি আদরের বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধিকন্তু ঐ বয়স পর্য্যন্ত যদি তাঁরা স্বাস্থ্যবান ও কর্ম্মপটু থাকেন তবে সেটা বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে মাথা উঁচু ক'রে দেখাবার জিনিস। বাংলার কৃতী সন্তান স্বনামধন্য স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐরূপ দীর্ঘায়ু বাঙালীদের মধ্যে অন্যতম। নিজের সুদীর্ঘ আশী বছরের জীবনটিকে তিনি দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে নিজেকে এক আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দাঁড় করিয়েছেন,—কর্ম্মজগতে এটা কম সাধনার ব্যাপার নয়। বাংলার ছেলে মেয়েরা আজ তাঁর আশী বছরের জন্মদিনে তাঁর দিকে চেয়ে দেখুক, তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখুক, এই চাই।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ জীবনে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন প্রচুর, কিন্তু ধনের

চেয়ে তাঁর গুণের আদর আমাদের কাছে ঢের বেশি। বাংলার বধূ লেডী যাদুমতী মুখার্জ্জি পাকাচুলে সিঁদুর পরুন—আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করি।

খাঁটি বাঙালী জগদানন্দ রায়

উড়ো ফ্যাশানের হাওয়ায় ক্ষণকালের জন্যও দোল খায় না এমন মানুষ সকল দেশেই কম, বাংলাতেও কম। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ যাঁর ফ্যাশান-অনুকরণ ধাতে সইত না আদৌ। খুব যে তিনি সেকেলে মানুষ ছিলেন তা বলা চলে না। তাঁর বয়স হয়েছিল মোটে ষাটের কিছু উপর। কিন্তু চাল-চলনে তিনি পিছিয়ে চলতেন আরো পঞ্চাশ বছর। পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, চলা-ফেরা ও কথা-বার্ত্তার ধাঁচাটুকু সব ছিল তাঁর খাঁটি বাঙালীর মত। কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে এসে বাড়ী ঢুকে উঠানে দাঁড়িয়ে হাঁকতেন, "মা ঠাকরুণ ঘরে আছেন?" জানতুম, এমন সেকেলে সম্ভাষণ কারু মুখে নেই জগদানন্দ বাবু ছাড়া। বাংলার মাটিতে তাঁর দেহ মন গড়া বলেই তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—বাঙালীত্বের অভিমান তাঁকে বাঙালীয়ানা শেখায় নি। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক এবং ছাত্রমহলে তিনি একান্ত প্রিয় ছিলেন তাঁর এই অকৃত্রিম ভাবটুকুর জন্যে। শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বাংলাদেশ আজ একটী খাঁটি মানুষ হারাল। বিজ্ঞান ও সাহিত্য-জগতে তাঁর গুণপনা ও অন্যান্য কৃতিত্বের কথা সকল কাগজেই বিশদভাবে বেরুচ্ছে। আমরা কেবল তাঁর খাঁটি চরিত্র-মাধুর্য্যটুকু প্রকাশ ক'রে তাঁর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল

রাধানগরে রামমোহন-স্মৃতি-মন্দির স্থাপনার প্রধান উদ্যোক্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুব আগের নয়। আন্দাজ বছর কুড়ি পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের পৌত্রবধূ স্বর্গীয়া জ্ঞানদাসুন্দরী একদিন আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সার্কুলার রোডে রাজার নামে যে লাইব্রেরী স্থাপন হয়েছে সেটি আমি দেখতে যাব, তোমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। শুনে উৎসাহ বোধ করলুম এবং বললুম—বেশ তো, কবে যাবেন বলুন। ঠিক হোল, একদিন সকালে আরো দু'তিন জন মহিলা আত্মীয়া সঙ্গে নিয়ে আমরা রামমোহন লাইব্রেরী দেখতে যাবো। ইচ্ছা অনেক সময় কার্য্যে পরিণত হয় না—বিশেষতঃ বড়ঘরের বাঙ্গালী মেয়েদের ভাগ্যে, মান-সম্ভ্রমের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাঁদের ঘাড়ে বেশী ক'রে! ভগবানের দয়ায় জ্ঞানদাসুন্দরীর এই সৎ ইচ্ছাটি কিন্তু কাজে ঘটে গেল সহজে। একদিন সকাল ন'টায় সঙ্গী আত্মীয়াদল নিয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী গিয়ে পৌঁছালেন লাইব্রেরীর দুয়ারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় কী আগ্রহভরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এখনো সেটি সুস্পষ্ট মনে আছে। জ্ঞানদাসুন্দরী পর্দ্দানসীন্,—আধ-ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাদিকে অগ্রগামী করে ধীরে ধীরে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন। সামনেই রাজার প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। রাজা রামমোহনের অতবড় ছবি ইতিপূর্ব্বে আমরা কেহই দেখি নাই। ঐ নমুনার ছোট আকারের ছবি অবশ্য কাগজে বইএ দেখেছিলুম অনেকবার, কিন্তু তেলে-রঙে ফোটান রাজার এমন জ্বলজ্বলে মূর্ত্তি এই প্রথম দর্শন। ভক্তিভরে সকলে ছবির সামনে মাথা নুয়ে প্রণাম করলেন। পালমহাশয়ের তাতে কি আনন্দ! ফেরার সময় জ্ঞানদা

সুন্দরী আমার হাতে দিলেন একখানি হাজার টাকার নোট সম্পাদক পাল মহাশয়কে দেওয়ার জন্য ; অন্যের টাকা বাহক হয়ে দিলুম অন্যকে, তবু দেওয়ার একটা অনির্ব্বচনীয় সুখে মন কতখানি ভরে' উঠেছিল— আজো সেটা ভুলি নাই।

এই ঘটনার পরেই রাধানগরে রাজার স্মৃতিমন্দির গড়ে' তোলার আন্দোলনে সহর তোলপাড় করে' তুলতে লাগলেন পাল মহাশয়।

বিরাট আয়োজনে সে কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন তিনি কত পরিশ্রমে, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তা' জানেন। সে যাত্রায় রাধানগরে পুণ্যবতী গোলাপসুন্দরী দেবীর অপর্য্যাপ্ত আতিথেয়তা সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয়েছিল যাত্রীদলের। পূর্ব্বদিন উপবাসী থেকে তিনি হাজার লোকের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন সারাদিন সারারাত—শুনলুম, পৌঁছে দেখি, তখনো তিনি খাওয়ানর ব্যবস্থায় খুব ব্যস্ত। উপবাসী আছেন শুনে সকলে ধরে পড়ায় স্নান করে' একটু সরবৎ মাত্র পান করলেন কত অনিচ্ছায়। নিজে উপবাসী থেকে অন্যকে পরিতৃপ্ত করে খাইয়ে সুখ পাওয়া এদেশের মেয়েদের একটা চিরাগত সংস্কার—প্রধানতঃ উপবাস-সহিষ্ণু বিধবাদের। রাজার নামে ডাক দিয়ে যাঁদিকে আনা হয়েছে তাঁদের প্রতি গোলাপসুন্দরীর এই আন্তরিক আদর আপ্যায়নে পাল মহাশয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সবার চেয়ে বেশী—তাঁর মাথার একটা বড় বোঝা যেন গোলাপ সুন্দরী নামালেন, এই রকম ভাবখানা।

পিতা-পিতামহীর জন্মস্থান দর্শন আমার জীবনে এই প্রথম। মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জাগলো ; যেন জন্মান্তরের স্মৃতি এসে মনকে জড়াতে লাগলো—সে এক বিস্ময়ের অনুভূতি। আমার ভাগ্যে যে এ স্থান দর্শন কখনো ঘটবে তা কল্পনাও করি নাই ; ঘটলো ভগবানের দয়ায় ও পাল মহাশয়ের দৌলতে। সেই থেকে মধ্যে মধ্যে পাল

মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে। রোগশয্যায় আমাকে স্মরণ করেছিলেন তিনি কয়েকবার। সাক্ষাতে একদিন কেঁদে বলে উঠলেন,— আর আপনাদের নিয়ে যেতে পারলুম না রাধানগর, রাজার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা হোল না আমি জীবিত থাকতে। এই কথার মধ্যে কি নিদারুণ মর্ম্মবেদনা জড়িত ছিল, বলার নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ পালকে আমরা ভাল করে জানি না, তবে এটুকু জানি যে তিনি একজন "অতিমাত্রিক" ধাতের মানুষ ছিলেন। ভাবতেন মাত্রা ছাড়িয়ে, কথা বলতেন মাত্রা ছাড়িয়ে, কাজ করতেন প্রচণ্ড আবেগে অনির্দ্দেশ্য আশার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে। তাঁর জীবনের বিশেষ কীর্ত্তি রাজা রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, দেশবাসী একথা স্মরণ ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধা করবে চিরদিন।

পুরী আশ্রমে স্নান-পূর্ণিমা

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী বসন্তকুমারী দেবী ১৩৩৭ সালে স্নান-পূর্ণিমা তিথিতে পরলোক গমন করেন। পুরী তীর্থে পুণ্য তিথি স্নান-পূর্ণিমার সমারোহ একটি স্মরণীয় ব্যাপার। জনসাধারণের আনন্দকোলাহলের মধ্যে প্রতি বৎসর পুরী আশ্রমে ঐদিন একটী পুণ্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সাধ্বী বসন্তকুমারীকে স্মরণ করে। বসন্ত কুমারী দেবীকে আমাদের যতটা জানা আছে তাতে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যই তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈধব্যের দীর্ঘ বারটি বৎসর তিনি কাটিয়েছেন স্বামীকে স্মরণ করে, শেষে স্বামীরই স্মরণার্থে পুরীতে পুণ্য প্রতিষ্ঠান এই বিধবাশ্রমটি গ'ড়ে রেখে গেছেন—অসহায়া বিধবাদের জন্য।

বর্ত্তমান কালোপযোগী ঔদার্য্য ছিল তাঁর যথেষ্ট। তিনি নিছক প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; অন্যায় ও অনিষ্টকর চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে

সদুপায়ে জীবিকা অর্জন করে বিধবাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেইভাবেই এখন বিধবাদের সেখানে তৈরী করা হচ্ছে। সহরের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকায় একটি সহজভাবে সেখানকার বিধবাদের মন ভরা থাকে সারাক্ষণ, এটি কম লাভ নয় তাদের জীবনে।

বিচিত্র সংগ্রহশালা

জৈন সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধনী নাহার পরিবার কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে বাস করেন। ধনী হলেও এঁরা আদৌ বিলাসী নন। পুরুষরা সকলেই সুশিক্ষিত—বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী—দৈনিক অভ্যাসেও সুসংযত ও পরিশ্রমী। অনেকেই এঁদের চেনেন, কিন্তু এঁদের নিজস্ব অধিকারে যে একটি বিচিত্র সংগ্রহশালা আছে সে খবর হয় তো সকলে জানেন না। কিছুদিন হল আমরা এই সংগ্রহশালাটির সন্ধান জেনেছি ও কয়েকবার গিয়ে সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর জিনিষগুলি দেখে আনন্দ পেয়েছি। পরিবারে কুমার সিং নাহার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তাঁর সম্পত্তির অংশ ভাইদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা না হয়ে 'কুমার সিং হল' নামে একটি বিচিত্র সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে সেই অর্থে। পুরাণো বনিয়াদি জমিদার ঘরে সাবেকী নক্সার অনেক বহু মূল্য ছবি, প্রস্তর মূর্ত্তি ও আসবাব পত্র দেখা যায়; সেগুলির কোন কোনটির নমুনা অপূর্ব্ব, কিন্তু তার অধিকাংশই বাবুদের বৈঠকখানার সাজ সরঞ্জামের সামিলে ব্যবহার হয় বলে বিশেষত্বটুকু চোখে এড়িয়ে যায় প্রায়ই। এখানকার সংগ্রহ স্বতন্ত্র রকমের। সংগৃহীত জিনিষগুলি পরিবারের ভোগের জন্য নয়—সাধারণকে আনন্দ দেবার জন্য। এখানে নাচ তামাসা বা কোন হাল্কা আমোদ হওয়ার জো নাই। প্রিয় মৃত ব্যক্তির এটি পবিত্র স্মৃতিমন্দির।

বাড়ীটি তিন তালা, উপর তালায় ঠাকুর বাড়ী, দুই ঘরে শ্বেত পাথরের ও স্ফটিকের তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি, যথারীতি পূজার্চ্চনা হয় প্রতিদিন। মাঝের তালায় "গোলাবকুমারী পাঠাগার।" নাহার মহাশয়েরা নিজের মায়ের নামে পাঠাগারটির নামকরণ করেছেন; দেখে আনন্দ হোল— বুঝলুম, পরিবারে মেয়েদের সম্মান আছে। বাছাই করা বইএর সংগ্রহ কম নয়, বসে পড়বার ব্যবস্থাও আছে বেশ।

নামজাদা সাবেকী লোকদের হাতের লেখা, পুরাতন চিঠি ও পুরাকালের জৈন নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা প্রভৃতি আরও রকমারী জিনিষের সংগ্রহ আছে পাঠাগারটিতে, দেখা গেল।

নীচের তালায় ছবি ও খুঁজে পাওয়া পুরাকালের পাথর-মূর্ত্তির সংগ্রহই বেশী। দেখার মত অন্যান্য খুচরো জিনিষও আছে ঢের। ছবিগুলির অধিকাংশ জৈন, মোগল ও রাজপুত নমুনার। প্রাচীন যুগের হিন্দু দেব দেবীর ছবিও দু'চারখানি আছে। মূর্ত্তিগুলি ভারতের নানা প্রদেশ থেকে বহু যত্নে সংগ্রহ করা।

নাহার সংগ্রহশালার বিশিষ্ট সম্পদ কতকগুলি প্রাচীন জৈন শাস্ত্র ও হাতে লেখা পুঁথী। পুঁথীগুলির মলাটের ও শাস্ত্রগুলি রেখে পড়ার কাষ্ঠপীঠের বিচিত্র নক্সা ও কারুকার্য্য দেখলে চমৎকৃত হ'তে হয়। বর্ণের চাকচিক্য ও নক্সার স্পষ্টতা আজও সেগুলির গায়ে ফুটে রয়েছে নূতন হয়ে। সে-যুগের কারিগরদের হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখে শিল্প-জগতে তাঁদের দান কত উঁচুতে ভেবে গৌরবে মন ভরে উঠে।

শত বার্ষিক স্মরণোৎসব

ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন অত্যাশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিহ্নিত মানুষটিই রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহনের অতি-অসাধারণ বুদ্ধি,

বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য, বহুভাষা, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল ও বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভার বিচিত্র প্রণালী-পদ্ধতি ঐ অত্যাশ্চর্য্য অন্তঃদৃষ্টির যোগে জাতির জন্য একটি অপূর্ব্ব সিংহাসন রচনা করেছে, যাতে ব'সে জাতি নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মানব হয়ে। রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের চেয়ে রামমোহন-রচিত সিংহাসনের রচনাকৌশল অপূর্ব্বতর ; বত্রিশ সিংহাসনে বসে বিক্রমাদিত্য একা অদ্ভুত কল্পনাযোগে অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করতেন, রাজা রামমোহনের রচিত সিংহাসনে সমগ্র মানবজাতি নিজের বিচিত্র ভাবসম্ভার ও কর্ম্মসম্ভার নিয়ে একযোগে সম্মিলিত ভাবে অনায়াসে বসতে পারে পাশাপাশি। এ-হেন সিংহাসনকে স্ফুটতর ও উজ্জ্বলতর করে' পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে হবে আজ তাঁর স্বদেশবাসীকে, তবেই তাঁর শত বার্ষিক স্মরণোৎসব সার্থক হতে' পারবে।

জাতি আজ সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত, যাত্রা তাদের জটিল পথে জড়িয়ে পড়েছে নানাদিকে। জলপথে জাহাজ চালাতে নাবিক যেমন অন্ধকারের অজানা বিপদ বাঁচাতে খুঁজুনে আলো (Search light) ফেলে চলতে থাকে, রাজা রামমোহনের অন্তঃদৃষ্টির অনুসরণ করে' সেই খুঁজুনে আলোটি জাতির গতিপথের চারিদিকে ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলতে থাকলে জাতি সমস্যা কাটিয়ে যাত্রা সুগম করে' পরিত্রাণের পথ খুজে নিতে পারবে, নিঃসন্দেহ। এই স্বাধীন-বুদ্ধির অবতার মানুষের বুদ্ধির জটা খুলতে জন্মেছিলেন। মেঘকাটা সংস্কারছাঁটা ঝরঝরে বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীকে স্পষ্টচোখে দেখতে শেখা রামমোহনের বুদ্ধির কাজ ; সকল যুগের মানবজ্ঞানের মিল খুঁজে পাওয়া ও সকল তথ্যের মূলতত্ত্বে যোগ দেখা তাঁর দূরক্ষেপী অন্তঃদৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য ফল।

এই শ্রেষ্ঠ যুগমানবের শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে জাতি শতোত্তর বৎসর এগিয়ে পড়ুক, ভয়হরণ ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মহানারী এ্যানি বেশাণ্ট

এ দেশের শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই সুপ্রসিদ্ধা ইংরাজ মহিলা এ্যানি বেশাণ্টের নাম শুনেছেন। অনেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিতও আছেন। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতায় আকৃষ্ট হয়ে শাশ্বত শান্তি লাভের আশায় পশ্চিমের যে-সব পুরুষ-নারী ভারতের শিক্ষা ও সাধনাকে শ্রেয়ঃজ্ঞানে জীবনে বরণ করেছেন, মনস্বিনী এ্যানি বেশাণ্টকে তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা বলা যেতে পারে। স্বাধীন দেশে জন্মে স্বাধীনতার সব রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েও ইনি ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। শত দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই জ্ঞান-তপস্বিনীর পরিপূর্ণ আত্মদান ভারতভাগ্যে একটি উজ্জ্বল চিহ্নিত তারার মত,—যার শুভসূচনা অদূর ভাবীকালে ভারতকে তার সুফল ভোগ করাবে—সন্দেহ নাই। ইতিহাসে এ-কাহিনী অমর।

ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও জনসেবা সকলদিক থেকে এই ভারত-প্রাণা নারী গত পঞ্চাশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতের সেবা ক'রেছেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যেক ভারতবাসীর আজ সে-কথা স্মরণ করার দিন এসেছে।

স্বর্গীয়া এ্যানি বেশাণ্টের মত বিদুষী মহিলা পৃথিবীতে কম। পশ্চিমের উচ্চ শিক্ষায় তিনি বিশিষ্টরূপে শিক্ষিতা, ভারতীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ শাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি অসাধারণ, আধ্যাত্মিক তেজেও তিনি তেজস্বিনী। এ হেন নারীকে আমরা 'মহানারী' অভিহিত করে তাঁর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-নিবেদন করছি।

কামিনী রায়

স্বনাম-পূজ্যা শ্রদ্ধেয়া ভগিনী কবি কামিনী রায়। শেষ দিনটিতেও দেশের কাজ—'শতবার্ষিক মহিলা-সম্মিলনীর নেত্রীত্ব করে' বিছানায় শুয়েছেন। এই নিরভিমানিনী শুদ্ধচিত্তা ভগিনী দেশের ডাক কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। নারী-হিতকর যে কোন কাজে মুহূর্ত্তের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আমরাও তাঁকে পেয়েছি যখন চেয়েছি। পুরী থাকার সময় পুরী আশ্রমে তিনি কয়েকবার গিয়েছেন ও নিজের স্বভাব-সুলভ সুমিষ্ট উপদেশ-আলাপে সেখানকার মেয়েগুলিকে মুগ্ধ করেছেন। কলিকাতার সরোজনলিনী সমিতির বাৎসরিক সভাতেও নেত্রীত্ব করে' সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের কৃতার্থ ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সুন্দরভাবে। বর্ত্তমান যুগে একাল-সেকালের সন্ধিক্ষণে জন্মে' বাংলার যে-সব সাধ্বী চরিত্রগুণে নারী-সমাজের প্রাতঃস্মরণীয়া, ইনি তাঁদের অন্যতমা।

সাধারণতঃ সকলের কাছে ইনি কবি কামিনী রায় বলে পরিচিতা। কবিত্বশক্তি তাঁর সহজাত। শিশুকাল হ'তে তিনি কবিত্বভাবময়ী। স্বভাবসুন্দর পবিত্র অন্তঃকরণের সঙ্গে মাধুর্য্য-মণ্ডিত সরস মনখানি সংযুক্ত হয়ে তাঁকে যে কবিতাগুলি লিখিয়েছে, ভাবসম্পদে ও স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গিতে তার তুলনা বাংলাসাহিত্যে বিরল।

স্বদেশী প্রদর্শনী

সাধারণতঃ বাড়ীর পুরুষরাই সচরাচর বাজার করে থাকেন, পছন্দসই জিনিষ দেখে শুনে কিনতে না পারার দরুণ মেয়েরা প্রায়ই খুঁৎ খুঁৎ করেন,—বলেন, পুরুষের কি পছন্দ! একটাও ভাল পাড়ের সাড়ী,

নতুন ফ্যাসানের ব্লাউস্, সৌখীন রুমাল, চুল বাঁধার ফিতা, কাঁটা, কিছুই মনের মত আনতে পারে না! প্রদর্শনীতে বাড়ীর মেয়েরা নিজে দেখে মনের মত জিনিষ কিনে নিতে পারে দরকার বুঝে। দলে দলে মেয়েরা প্রদর্শনীতে যেতে পারেন—দেখে, শুনে, বেড়িয়ে আনন্দ পান যথেষ্ট। মন-খুসী-করা, কাজ-মেটান, অথচ দেশের জিনিষ কিনে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন, একসঙ্গে ঘটে উঠাটা কি লাভের বিষয় নয়! বায়স্কোপের ক্ষণিক খুসীর হালকা আরামটুকুর জন্তে ব্যয় করে সহরের লোকরা নিতান্ত কম নয়। সেই টাকায় প্রদর্শনীর জিনিষ কিনে দেশের প্রতি দরদ দেখানো কত দরকার, বলতে হবে কি!

দেশের তৈরী জিনিষগুলিতে দেশের মানুষের বুদ্ধির পরিচয়, কল্পনার দৌড় ও শ্রমের মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে মনের সামনে, তাদের প্রাণ নিজের প্রাণে এসে স্পর্শ করে নিবিড় ভাবে। প্রাণবান মানুষ সেটা উপলব্ধি না করে পারে না।

ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন

রাজা রামমোহনের বড়ছেলে রাধাপ্রসাদের দুই কন্যা। তাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না। বড় মেয়ে চন্দ্রজ্যোতি, ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী। নাম দু'টি রাজারই রাখা। রাজার বড় পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতির দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিবাহ দেন মুর্শিদাবাদ-নিবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সমাজচ্যুতির ভয়ে রাজার পৌত্রীকে সে সময় অনেকেই বিবাহ করতে নারাজ হন, যদিও চন্দ্রজ্যোতি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। দশবৎসরের পৌত্রীটির পিতামহকে মনে ছিল স্পষ্ট; পরজীবনে চন্দ্রজ্যোতি নিজের নাতী-

নাতনীদের কাছে রাজার সম্বন্ধে অনেক গল্প করতেন। দুঃখের বিষয় তার মধ্যে অনেকগুলি ছোটখাট গল্প এখন স্মরণ থেকে স'রে গেছে। দু'একটা টুকরো যা মনে আছে তাই জুড়েগেঁথে বাঙলার ছেলেমেয়েদের কাছে উপহার দেওয়া হচ্ছে।

চন্দ্রজ্যোতি বলতেন, রাজাকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে; দুঃখ হয় যে একালের কাউকে দেখাতে পারলাম না কি বলিষ্ঠ দেহখানি ছিল তাঁর। ভোরে উঠে দু'হাতে দুটো ভীমের গদার মত মুগুর নিয়ে ভাঁজতেন তিনি খেলার মত হেলায়। বিশ-বাইশটা জলভরা সারি সারি সাজান কলসী স্নানের সময় রাজা মাথায় ঢালতেন চৌকীতে বসে স্বয়ং একটির পর একটি একবার ডান হাতে একবার বাঁহাতে নিয়ে।

দুপুরে খেতে আসতেন অন্দর মহলে প্রতিদিন, তার ব্যতিক্রম হ'ত না কখনো। বাড়ীর মেয়েরা ছোট বড় সবাই ঘিরে বসত' তাঁকে খাওয়ার সময়। রান্না হ'ত অনেক পদ—শুক্তানী থেকে পরমান্ন পর্য্যন্ত প্রতিদিন—সঙ্গে থাকতো সরুচাকলী খানকতক, রাজা ভাল বাসতেন বলে'। পাক করতেন ঘরের মেয়েরা স্বহস্তে সব; তখনকার দিনে ঠাকুর রাখার চলন ছিল না কোনো পরিবারে, সবাই জানে। রাজা রাঢ় দেশের মানুষ, কড়াইয়ের ডাল পছন্দ করতেন খুব বেশী, চন্দ্রজ্যোতি বলতেন। বাহির মহলে সারাদুপুর কাজ ক'রে বৈকালে পায়ে হেঁটে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। যাওয়ার আগে অন্দরে এসে খানিকক্ষণ বসে' যেতেন নিয়মিত, তারও ব্যতিক্রম ঘটত' না কখনো। চেয়ার পড়ত' তিন খানি, দু'খানি দুই স্ত্রীর, একখানি নিজের। স্ত্রীদের আগে না বসিয়ে রাজা নিজে বসতেন না কখনো—সেকালে সেটা একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। অন্দরের আর পাঁচজন উঁকিঝুঁকি মারতো, পরস্পর বলাবলি করতো—দেখ, দেখ, কর্ত্তাদেওয়ানজি দাঁড়িয়ে আছেন; বসবেন না, স্ত্রীরা না বসলে।

চন্দ্রজ্যোতির বিবাহ দেন রাজা কলকাতার বাড়ীতে—দেশে গিয়ে কাজ করার যো ছিল না তাঁর তখন—জাত গেছে। সম্প্রদান করান রাজা পুত্রবধূ যজ্ঞেশ্বরী দেবীকে দিয়ে, চন্দ্রজ্যোতির বাবা রাধাপ্রসাদকে দিয়ে না করিয়ে। সম্প্রদানের সময় নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। বিবাহ হ'ল যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠানে। রাজার পৌত্রীকে বিবাহ করায় শ্যামলাল নিজের দেশ মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন নাই—তাঁর জ্ঞাতিভাইরা এখনো সেখানে বাস করেন। এই বিবাহের পরেই রাজা বিলাত যাত্রা করেন। ছোট পৌত্রী মৈত্রেয়ী দেবী তখন নিতান্ত শিশু, তাঁর রাজাকে আদৌ মনে ছিল না। চন্দ্রজ্যোতি বলেন, রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরুপ্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রী থেকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে ইদানিং আমরা নিজের কানে শুনেছি। গায়ত্রী জপও করতেন তিনি রীতিমত। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে,—ধর্ম্ম-সংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম। রাজার ছোট স্ত্রী উমা দেবী ছিলেন নিঃসন্তান, বড় স্ত্রীরই দুটি ছেলে—রাধাপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ। রমাপ্রসাদ জন্মান রাধাপ্রসাদের জন্মের আঠার বৎসর পরে। জন্মসময় থেকেই বিমাতা উমা দেবী রমাপ্রসাদকে পালনের ভার নেন একান্ত অনুরাগের সঙ্গে স্বেচ্ছায়। পুত্রস্নেহে পালন করেছিলেন তিনি তাঁকে এত যত্নে যে যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও রমাপ্রসাদ জানতেন না যে ইনি তাঁর বিমাতা কি গর্ভধারিণী। ভ্রাতুষ্পুত্রী চন্দ্রজ্যোতি ছিলেন বয়সে রমাপ্রসাদের প্রায় সমবয়সী ; ভাইঝিকে রমাপ্রসাদ দিদি বলে ডাকতেন। পিঠোপিঠির মত দুজনে মারামারিও হ'ত। গল্প শোনা যায়—শিশু

রমাপ্রসাদকে পিতা রামমোহন পরীক্ষা করার জন্য দুই মায়ের সামনে একদিন বলেছিলেন—কে তোমার মা বলতো? শিশু দৌড়ে গিয়ে বিমাতাকে জড়িয়ে ধরে বললে 'এই'। পরজীবনে ঘটা করে' রমাপ্রসাদ যে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন সে এই বিমাতারই। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্‌টির নামকরণ যাঁর নামে সেই চন্দ্রনাথের উমাদেবী ছিলেন আপন পিসিমা। বড় স্ত্রীর মৃত্যু হয় রাজা দেশে থাকতে আগেই; ছোট স্ত্রী জীবিত ছিলেন রাজার বিলাত যাত্রা কালে। যাওয়ার খবর কিন্তু রাজা তাঁকে জানিয়ে যান নাই। রাজা জাহাজে রওনা হয়ে যাবার পরে সে খবর তিনি পান। রাজা আর ফিরতে পারলেন না,—ওঁর সঙ্গে আর দেখা হ'ল না; এই শোকটা তিনি জীবনে কখনো ভোলেন নাই। ঘটনাগুলি রাজার পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতির চোখে দেখা—কানে শোনা খবর মাত্র নয়।

মহাতেজস্বিনী রামমোহন-জননী তারিণী দেবী সাধারণ নারী ছিলেন না। পরিবারের ছিলেন তিনি ফুল বৌ—তাই শ্বশুরকুলে তাঁর ডাকনাম ছিল ফুলঠাকুরাণী। বিষয়বুদ্ধি ছিল তাঁর এতই প্রখর যে স্বামী জমিদারীর কাজ চালাতেন তাঁর পরামর্শ নিয়ে। বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

জমিদার-সরকারের কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে তাঁর আইনসংক্রান্ত কূট প্রশ্নে বিস্মিত ও চমৎকৃত হ'ত, শোনা যায়। একনিষ্ঠ দেবভক্তি তাঁর এতই ছিল প্রবল যে, দেবতার নামে প্রাণসম পুত্র রামমোহনকে বিধর্ম্মী-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন। মায়ে-ছেলেতে এ নিয়ে গোল বেধেছিল কম নয়। চন্দ্রজ্যোতি নিজের মা-ঠাকুরমার মুখে শুনেছিলেন—দেশে গিয়ে রাজা একদিন মাকে প্রণাম করতে গেলেন পদধূলি নিয়ে। মা বল্লেন,—যে সন্তান আমার ঠাকুরকে প্রণাম না করে, আমি তার প্রণাম

গ্রহণ করি না। রাজা এদিকে মাকে প্রণাম না করে ফিরবেন না। ফলে তিনি রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সামনে মাথা নামিয়ে বললেন—"মায়ের ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম করি।" তবে তিনি মায়ের পায়ের ধুলো নিতে পেরেছিলেন।

রাজা রামমোহনের মা তারিণী দেবী ছেলের ধর্ম্মকে শেষে আর তেমন তীব্র ও কঠোর দৃষ্টিতে দেখতেন না। জীবনের শেষ সময়ে মায়ের মন নরম হয়ে আসে অনেকখানি। রাজাকে ডেকে তিনি একদিন বল্লেন, তোর ধর্ম্ম তুই পালন কর, আমাকে বাপু শ্রীক্ষেত্রে পাঠিয়ে দে। রাজা সুবন্দোবস্ত করে একজন আত্মীয়া মহিলা সঙ্গে দিয়ে মাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। জীবনান্ত পর্য্যন্ত তারিণী দেবী শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের এক এক ধাপ সিড়ি তিনি প্রতিদিন নিজের হাতে ধুতেন ও নিজের চুল দিয়ে সেটি মুছতেন, শোনা গেছে।

পরিবারে রামমোহন

রামমোহনের পরিবারের লোকের মুখে শোনা গেছে, রামমোহনের এক আত্মীয়া (সম্ভবতঃ পিসি) শ্বশুর বাড়ীতে থেকে কষ্ট পাচ্ছিলেন খুব। সে খবরটা বাপের বাড়ীতে পৌছুতে পারছিলেন না কোন রকমে ; বাঁধা পড়ে ছটফট করছিলেন চাপের মধ্যে দিনরাত। সেই পরিবারের ছোট ছেলেরা পড়তে যেতো পাঠশালায়। ঘরে ফিরে অবসরসময় খেলার ছলে ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেয় রামখড়ি দিয়ে অক্ষরগুলি আঁককেটে লিখত তারা যখন তখন। দেখে দেখে আত্মীয়া মহিলাটি অক্ষরগুলি চিনে ফেলেছিলেন সহজে ; গৃহকর্ম্মের অবসরে বসে বসে তিনি রামখড়ি দিয়ে দাগা বুলোতেন সেই অক্ষরগুলির উপর। ক্রমেই সেগুলি তাঁর আয়ত্ত হয়ে এল যথাযথ। সেই গাঁয়ের একটি ছোট জাতের মেয়ে বাচ্ছিল

তার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে কোন কাজে। গোটা গোটা ছাঁদে একখানা কাগজে তিনি পত্র লিখে পাঠান বাপের বাড়ীতে। রামমোহনের হাতে সেই পত্রখানা পড়ে। চিঠি পড়ে, রামমোহন মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকেন অনেকক্ষণ, শেষে একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলেন—মেয়েদের এত বুদ্ধি, কিছু না শিখে এমন একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে! এদের শেখালে না জানি এরা কত না বিদ্যা অর্জ্জন করতে পারে! এই বলে লোক পাঠিয়ে আত্মীয়াকে তিনি বাড়ী আনিয়ে নেন কিছু দিনের জন্য।

অন্দরে তিন খানি চেয়ার পাতার ব্যবস্থা করেন রাজা নিজে। ছোট স্ত্রী উমা দেবী ছিলেন সুন্দরী, বড় স্ত্রী তেমনটি নয়। রাজা অন্দরে এলে বড় স্ত্রী দুয়ার-আড়ালে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দিতেন ছোট উমা দেবীকে—'তুই যা দেওয়ানজীর সামনে বসগে; আমি বাপু থাকি আড়ালে।' দিনের বেলা রাজার সামনে বেরুতে তিনি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করতেন—সে কালের নারী! উমা দেবী এগিয়ে এলে রাজা বলতেন দাঁড়াও তোমার বসা হবে না আগে; তিনি বসলে তবে তুমি বসবে। জড়সড় হয়ে বড় স্ত্রী সামনে এসে ধীরে ধীরে চেয়ারখানিতে বসতেন, তার পর বসতেন উমা দেবী, শেষে রাজা।

রামমোহনের পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের স্ত্রী দ্রবময়ী দেবীর মুখে শোনা, রাজা নিজের দুই স্ত্রীকে ব্রহ্মোপাসনা ও গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দেন স্বয়ং। দ্রবময়ী শাশুড়ী উমা দেবীর কাছে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা পান। তিনি আবার তাঁর পুত্রবধূদের সেই মন্ত্র দিয়ে যান। বাইরে কথাটা ছড়িয়ে না পড়লেও পরিবারের মধ্যে সংস্কার সুরু হয়েছিল রাজার দৌলতে সেই সময় থেকেই। রাধাপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ দুই ভাই ও রাধাপ্রসাদের দুই দৌহিত্র উপনিষদপাঠ, ব্রহ্মোপাসনা ও গায়ত্রীর ধ্যান শিক্ষা করেছিলেন যথারীতি।

রামমোহন কাউকে নিজের উচ্ছিষ্ট খেতে দিতেন না—পরিবারের

ছোট ছেলে মেয়েদেরও নয়। লোকে বলতো—তিনি 'গুপ্ত অবধূত' ছিলেন, তাই। অবধূতরা নাকি কাউকে নিজের উচ্ছিষ্ট দেন না। রাজার একজন বড় দরের তান্ত্রিক গুরু থাকাই এই রটনার কারণ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টিকাকার কুলাবধূত হরিহরানন্দ ভারতী রাজার তন্ত্রমতের সাধনগুরু ছিলেন, সকলের জানা। কথিত আছে, রাজা বহু সাধ্যসাধনায় গুরুকে একবার কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে আনেন। তিনি "অনিকেতবাসী" অর্থাৎ গৃহে বাস করেন না। রাজার বাড়ীর বাদামগাছতলায় তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে ব'সে রাজার গুরুকে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করতে অনেকে দেখেছেন, শোনা গেছে। সাধনার পরিণতিতে পরে রাজা কোন সিদ্ধান্তে পৌছান, কোন ধারা ধরেন, দশের জানা আছে। এখানে সে আলোচনার স্থান নয়।

হরিহরানন্দ কুলাবধূত রাজার ব্যক্তিগত গুরু, রায়গোষ্ঠির বংশগত কুলগুরু নন।

নারায়ণপুর অমৃত-সমাজ

কলিকাতার কাছে দমদমা,—দমদমার কাছেই নারায়ণপুর গ্রাম। নামটি গ্রামের পুরাণো হ'লেও গ্রামটিতে একটি নূতন পত্তন সুরু হয়েছে কিছুকাল থেকে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী শীল-পরিবারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার নারায়ণপুরে বিস্তর জমি-জমা কিনে নিজেও বাড়ী ঘর তৈরী করে' বসবাস করছেন, লোকবসতও করিয়েছেন অনেকগুলি। ছেলেদের জন্য উচ্চ ইংরাজী স্কুল, বয়স্কা মহিলাদের জন্য সমিতি, ছোট একটি বালিকা বিদ্যালয়—তা ছাড়া কাঠের কাজ শেখানো, তাঁত, আসন বোনা প্রভৃতি আধুনিক সকল রকম শিক্ষারই অল্প-বিস্তর ব্যবস্থা হয়েছে গ্রামটির মধ্যে। দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে

গ্রামবাসী গরীবদের জন্যে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় দেখা যায়—আশে পাশে এখনও বিস্তর খালি জমি প'ড়ে, বসত নাই। হঠাৎ মনে হয়, গ্রামে যেন লোক নাই মোটে। কিন্তু কাজের সূত্রে দুই-একবার সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, ডাক দিলে লোক জড় হয় কিছু কম নয়।

এবার দেখা গেল, ঐ সবের সঙ্গে আরও বড় দরের একটি ভাব গ্রামের লোকগুলির মনের উপর কাজ ক'রে তাদিকে উচ্চ ধারণায় সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তুলছে আর এক দিক থেকে। গ্রামের মাঝখানে সাদাসিধা ছোটখাট পরিচ্ছন্ন একটি ভজনগৃহ তৈরী হয়েছে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ভজনের জন্যে। ঘরটির গায়ে লেখা আছে—"সকল ধর্ম্মে এক ভগবান।" ঐ বড় ভাবটিকে আশ্রয় ক'রে তাদের মধ্যে অনেকগুলি মানুষ একজোট হ'য়ে 'অমৃত সমাজ' নাম দিয়ে একটি নূতন সমাজ খাড়া করে' তুলেছেন নিজেদের মধ্যে। অমৃত-সমাজের সভ্যগণের মত, ধারণা ও ব্যবহারের কয়েকটি লক্ষণ এখানে উল্লিখিত হ'ল। তাঁরা বলেন, হিন্দু সমাজ এক বিরাট অমৃত-সমাজে পরিণত হবে এবং কাজ ফুরোলে অবশেষে সেটি বিশাল হিন্দু সমাজেরই অঙ্গে বিলীন হ'য়ে যাবে। তাঁদের মতের অভয়বাণী—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" ভগবানের ওঙ্কার নামের তাঁরা জয়ধ্বনি ক'রে থাকেন। উপনিষদ গীতাকে সত্যের উৎস ব'লে স্বীকার করেন। গীতার ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ও যে কোন দেবতার উপাসক নিজের ধর্ম্মে ও উপাসনাপদ্ধতিতে নিষ্ঠাবান থেকেও অমৃত-সমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারেন। পবিত্রতা ও দৃঢ় সংকল্পের চিহ্ন স্বরূপ শক্ত ইস্পাতের তৈরী একটি 'ওঁ' তাঁরা সর্ব্বদা কাছে রাখেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অমৃত-সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রতি রবিবার সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচার

করা তাঁদের একটি কাজ। খাওয়া-দাওয়া বিবাহাদি ব্যাপারে জাতিগত ভেদবৈষম্য লুপ্ত করা তাঁদের আর একটি কাজ। অস্পৃশ্যতা ও কুলকৌলীন্তের আদৌ স্থান নাই অমৃত-সমাজে। পাত্র-পাত্রী যোগ্য বিবেচিত হ'লেই বিবাহ প্রশস্ত। সামাজিক অন্য কোন বাধা থাকবে না তার মধ্যে। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান ও পুত্র-কন্যার শিক্ষা সমান বাধ্যতামূলক তাঁদের মতে। বিধবা, বিপত্নীক উভয়ের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই আদর্শ; প্রয়োজন বোধ হ'লে পুনর্বিবাহ প্রশস্ত। পুরুষের ন্যায় নারীও চিরকুমারী থাকার অধিকারিণী। শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কারাদি বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে যে আকারে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

নারায়ণপুরে অমৃত-সমাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। পাতিপুকুরে অমৃত-সমাজের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে একটি অনাথ-আশ্রমগৃহ নির্ম্মিত হ'চ্ছে। শীঘ্রই হিন্দু অনাথ-আশ্রমও খোলা হবে।

আমরা সসম্মানে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই অভ্যুদয়কে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করছি।

দেশের মেয়ে সরোজিনী দত্ত

খাঁটি বাঙালী পরিবারের নিজস্ব ধাঁচায় গড়া মেয়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত বৈধব্যের পর পিতার আজ্ঞায় স্কুলে ভর্ত্তি হন ও ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ক্রমে এম-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা শেষ করে' বেথুন কলেজে উদ্ভিদ্ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করার পর কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় উন্নততর যোগ্যতা লাভের জন্য তিনি Study leave নিয়ে বিলাত যান। সেখানে দু' বৎসর অধ্যয়নের পর

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন গত আগষ্ট মাসে ও এখানকার কাজে যোগ দিয়াছেন ১লা সেপ্টেম্বর থেকে।

বাঙালীর মেয়ের উচ্চশিক্ষালাভ ও উচ্চতর ডিগ্রি পাওয়া কম গৌরবের কথা নয় জাতির দিক থেকে। এত গেল এক তরফা—অন্যদিকে ফেরার পর দেখা হওয়ায় দেখ্‌লুম, মানুষটির ধাঁচা বদল হয়নি এতটুকু, যেমন ছিলেন তেমনিটি ফিরেছেন হুবহু। কোথায় কাঁটা-চামচ, টেবিল চেয়ার সোফায় শোয়া-বসার বিশিষ্ট আয়োজন?—ফিরেই রুগ্না বোনের সেবায় লেগেছেন ও তাঁর ঘর-কন্নার কাজ দেখতে সুরু করেছেন দেশের মাটিতে পা ফেলা মাত্র। নিজের ঘর-সংসার নাই তবু বোনের সংসার বজায় রাখার দায় পোয়াতে হবে তিনি জানেন, কারণ তিনি বাঙালী মেয়ে।

দেশী ধরণ বজায় রেখে বিদেশী জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করা কত সুন্দর ও দেশী সমাজের পক্ষে সেটি কত কল্যাণকর ভেবে দেখা খুব দরকার। বিদেশী মাটিতে দেশী প্রাণের শিকড় বসাতে যাওয়া কতখানি বিপজ্জনক চোখ খুলে দেখার সময় এসেছে। সারাদিন বাইরে ঘুরে সন্ধ্যায় নিজের ঘরে এসে বিশ্রামের সুখটুকুর দর যাঁরা বোঝেন ও সকল অবস্থার মধ্যে শান্তির স্বাদ যাঁরা পেতে চান, দেশের বুকে মাথা রাখার সুবুদ্ধিটুকু তাঁরা কখনও খোয়াবেন না, আমাদের স্থির বিশ্বাস।

পায়ের চিহ্ন

রূপকথায় শোনা আছে, এক রাজার রাজ্যে রাজ্য শুদ্ধ মানুষ, ঘোড়াশালার ঘোড়া, হাতিশালার হাতি, ঘরে দুয়ারে ঘুরে-বেড়ান কুকুর বেড়াল, ঝোলান খাঁচায় ভরা রংবেরংএর পাখী সব মরে পড়ে রয়েছে এক সঙ্গে—যে যেমনটি ছিল ঠিক্ তেমনটি।

কে জানে কে কখন কালো রঙের লোহার কাঠি ছুঁইয়ে চঞ্চল-চেতন-রাজ্যে এই অজ্ঞাত স্পন্দহীন ব্যাপার এনে ফেলেছে এক মুহূর্ত্তে।

রূপকথায় বলছে শেষে, মৃত্যু-রাক্ষুসীর হাত এড়িয়ে বেঁচে আসা সেই রাজ্যেরই একটি ছেলে কোথা থেকে এক ভাঁড় অমৃতকুণ্ডের জল পেয়ে ছিটতে আরম্ভ করলো সকলের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠলো মরা রাজ্যটা আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে।

যে দেশ যে জাতি মরে আছে সকল দিকে—ভূকম্প, জলপ্লাবন, অজন্মা, মহামারী পূর্ণগ্রাসে গ্রাস করছে তাদিকে প্রতি মুহূর্ত্তে, বিরোধ-বিচ্ছেদে ছিন্ন ভিন্ন যারা ঘরে পরে, তাদের গায়ে অমৃতকুণ্ডের জল ছিটায় কে, সত্য বুদ্ধিতে তাদের এক করে কে?

ঐশ্বরিক প্রেরণা নামা চাই সে জাতির জীবনে। সেই অমৃতময়ী প্রেরণার গুণে জাতি জাগ্রত হবে, কর্ম্ম মুখরিত হবে, প্রেরণার ডাকে সাড়া দেবে মুহুর্মুহু, এগিয়ে চলবে তার গতির বেগে অদম্য উৎসাহে।

প্রেরণা অদৃশ্য, তাকে ধরা যাবে মানুষের মুখের উচ্চারিত সত্য বাণীতে; মানুষের হাতে খোঁড়া মাটি ফোঁড়া নিত্য নূতন সৃজন-শক্তির নব পল্লবিত অফুরান্ত অঙ্কুরে।

প্রেরণার পথ চেয়ে থাকতে হবে জাতিকে, রাস্তা খুলে রাখতে হবে তার সহজে সোজা ভাবে নামবার। তারই পায়ের চিহ্ন পড়েছে আজ পথের বুকে, দেখা যাচ্ছে।

নারী-সংক্রান্ত আইন সংশোধন-প্রচেষ্টা

বাংলা দেশের হিন্দুনারী আইনতঃ কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করেন, সকলেই জানেন। ভারত-নারী-সম্মেলনের কলিকাতাস্থ শাখা

এই আইন সংশোধনের জন্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। এ সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ করেন বহু নারী, কিন্তু প্রতিকারের সাহস হয় না প্রায় কারও। নারীদের সমবেত চেষ্টায়—সম্যক না হলেও—এর কিছু প্রতিকারের আশা করা যেতে পারে। আইন জিনিষটি যে বিভীষিকা নয়—শুধু পুলিশ-আদালতের ভয়াবহ মূর্ত্তি নয়—সুশৃঙ্খলে সমাজব্যবস্থা রক্ষার সদুপায়, এই কথাটি প্রথম সাধারণভাবে এদেশের সকল নারীকে বুঝতে ও বোঝাতে হবে। ভয় ভেঙে স্পষ্ট চোখে আইনকে দেখতে শিখলে মেয়েরা সাহস পাবে অনেকখানি।

এই আন্দোলনের ফলে মেয়েরা যে অন্যের অধিকার কাড়তে ব্যস্ত হয়েছে এ ধারণা যেন কেহ না করেন। পুরাতন আইনে তাদের জন্যে পূর্ব্ব হতেই যে ব্যবস্থা আছে তাকে ঝালিয়ে নূতন করে সকলের সামনে তুলে ধরা এই আন্দোলনের প্রথম কাজ। কিছু পরিমাণ অধিকার বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা তার সঙ্গে অবশ্য আছে যে অধিকার ন্যায়-ধর্ম্ম অনুসারে শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের উপর মেয়েরা দাবী করতে পারে। শ্বশুরের সম্পত্তিতে বিধবা বধূর খোরপোষের আইনতঃ দাবী আছে। কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবারে সহস্র সহস্র বিধবা পুত্রবধূ এই খোরপোষে বঞ্চিত হয়, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ছে; কোন উপায় করতে পারি না আমরা একা। দুঃখে লজ্জায় অপমানে নিঃশব্দে বাংলার নারীদিকে দুঃসহ এই দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

"খোরপোষ পাবে" কথাটা তাদের কানে শোনা আছে। কত পাবে, কে দেবে, কি পাবে—সম্পত্তির অংশ পাবে, কি খোরাকির টাকা পাবে—কি যে ঠিক পাবে তা সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট। গোলেমালে ব্যাপারটা আসলে ভেস্তে যায় প্রতিমুহূর্ত্তে। বাকী থাকে মামলা করে আদায়

করা। তা অনেকেরই পক্ষে অসাধ্য। মামলার খরচ যোগায় কে? ফলে মেয়েরা কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পথে দাঁড়ায়, ভেসে বেড়ায়—শেষে দুর্গতির চরমসীমায় ঠেকে। প্রতিকার প্রয়োজন, নিঃসন্দেহ। ভারত-নারী-সম্মেলনের উদ্যোগকে আমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। চেষ্টা সফল হোক, এই প্রার্থনা।

নারীর ইহলোকের সদ্গতি

সদ্গতি চায় সবাই, যে পায় সে ভাগ্যবান। পরলোকের সদ্গতি বড়, ইহলোকের সদ্গতি ছোট—এই একটা ধারণা মানুষ-সমাজে চলে আসছে অনেককাল থেকে। এর উপরে ভর করেই ইহলোকের সকল সৌভাগ্যে বঞ্চিতা নারীকে পরলোকের সদ্গতির দিকে তাকিয়ে চলতে শেখান ও অভ্যাস করান হয়ে এসেছে এযাবৎকাল এদেশে। কিন্তু উভয় লোকের সদ্গতিই যে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর একান্ত কাম্য একথাটা আজ ভাল করে বুঝতে হবে সকলকে। ইহলোকের দুর্গতি কম ভয়ের জিনিস নয় পরলোকের দুর্গতির চেয়ে। অর্থহীন অসহায় নারী দুর্গতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে পদে পদে। সে দুর্গতিতে অনেক সময় তার ইহকালও নষ্ট হয় পরকালও নষ্ট হয়। অতএব নারীকে যদি সংসারে বাঁচতে হয় তবে তাকে ধনবল, জনবল, নৈতিকবল, জ্ঞানবল—সকল বলে বলশালিনী হতে হবে।

সমাজের শক্ত মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হলে নারী সম্বন্ধে আইনের আঁটাআঁটিরও বিশেষ প্রয়োজন। আইন সমাজের লৌহবর্ম্ম। নরনারী উভয়ের শরীর-মন অর্থ-সামর্থ্য, সবকে সে অন্যায় আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে

রাখে সকল সময়। নারী সুরক্ষিত থাকা সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে মহামঙ্গল—কে না জানে! আইনের শক্ত বেড়ায় বাঁধন না দিলে নারীর মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা সুরক্ষিত থাকা সুকঠিন। অরক্ষিত নারীর বাইরে বিপর্য্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন পদে পদে, তাদের সম্বন্ধে আইনের অস্পষ্টতা তাদিকে ঘরের ভিতরেও বিপর্য্যস্ত করে তার চেয়ে কিছু কম নয়—এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

নারী-নিগ্রহকারী দুর্বৃত্তদের গুরুদণ্ড দান সরকার পক্ষের যেমন একান্ত কর্ত্তব্য—যথাসর্ব্বস্বে অন্যায়রূপে বঞ্চিতা দুঃস্থা বিধবা নারীর অন্নবস্ত্র সংস্থানের পাকাপোক্ত আইন করাও সরকারের তেমনি কর্ত্তব্য। যে আইন আছে তাকে কাজে লাগান যায় না বহু স্থানে। সামাজিক ও পারিবারিক চাপে আইনকে কণ্ঠরুদ্ধ করে ফেলা হয় কত জায়গায়—কে তার খবর রাখে! এ সম্বন্ধে দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বর্ত্তমানে নারী সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন হোক এদেশে, যে আইন আছে তাকেই সুন্দর ভাবে সংশোধন করে।

ইহলোকে সদ্‌গতির ব্যবস্থা না হ'লে পরলোকের সদ্‌গতি সুদূর-পরাহত হয়ে থাকবে। ইহলোকের দুর্গতি নারীকে পরলোকেও দুর্গতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে—এ কথা ধ্রুব সত্য।

মেসের চাকর

অধ্যাপক বিজয় বাবু একদিন অসময়ে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে দেখেন তাঁর দশবছরের পুরণো চাকর গোকুল দাস তাঁর বসবার ঘরের ডেস্ক থেকে এই বছরের নূতন প্রস্তুত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রখানি বের করে

অত্যন্ত অনায়াসে ও প্রসন্ন চিত্তে একটি কলেজের ছাত্রের হাতে সমর্পণ করছে।

প্রথমটা দেখে তিনি ত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে একটি কথা বের হল না। শেষে অসহ্য বিরক্তি ও দুর্দ্দমনীয় রাগের বেগ সম্বরণ করে, বজ্রকঠিন স্বরে বল্লেন, "গোকুল, একি কাণ্ড! তুই কি জানিস না যে এই প্রশ্নপত্র চুরির জ্বালায় আমাদের বছর বছর কত না নাকাল হতে হয়, বিশেষতঃ এই বছর এর জন্যে সকলের কি না দুঃখ ভোগ, কি না দুর্গতিই ঘটেছে। জেনে শুনে তোর এই কাজ! আমি না তোকে প্রতিদিন কলেজে যাবার সময় সাবধান করে দিয়ে যাই যে দেখিস গোকুল, আমার লেখবার ডেস্ক থেকে একখানি কাগজ যেন কোথাও না সরে। এই কি তোর সেই কথা রক্ষা করা, এই কি বিশ্বাসী চাকরের কাজ?"

গোকুল প্রস্তরমূর্ত্তির মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে কথাটি নাই।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঐকান্তিক আবশ্যকতা ও ব্যর্থ হওয়ার নিরতিশয় দুঃখ যে-সকল দুর্ব্বলচিত্ত ছাত্রের নিতান্ত অসহ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ গোকুলের কাছে এসে পূর্ব্ব হতে প্রশ্নপত্রখানি বের করে দেবার জন্যে যখন তাকে কাতর ভাবে অনুরোধ করতো তখন তাদের সেই কাতরতা, তাদের অন্তরের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা তার মনকে এতদূর গলিয়ে ফেলত যে সে আর কোন কথা ভাববার অবকাশ পেত না। একবার নয় আরও দু তিন বার সে তাদের জন্য এই কাজ করেছে।

অনেক সময় সে ভাবত, এ কাজ করে মনিবের প্রতি হয়ত সে খুব অন্যায় করছে। কিন্তু ছাত্রদের কাতর দৃষ্টি যেই তার মনের সামনে ভেসে উঠত অমনি তাকে আর সব ভুলিয়ে দিত। তার ক্ষুদ্রবুদ্ধি এই বলে এর মীমাংসা করত যে আমার মনিবের ত এতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

ছাত্রদের ব্যগ্রলোলুপ অন্তঃকরণের কাছে কাগজখানি ধরে দিয়ে গোকুল যে একটী গভীর তৃপ্তি অনুভব করত তার কাছে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সে আর মোটেই খাটাতে পারত না। তাদের উদ্বেগের সান্ত্বনা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মধ্যে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলত।

আজ মনিবের মুখের তীব্র ভর্ৎসনায়, অন্যায় স্নেহের দুর্ব্বলতা ও ন্যায়ের কঠিন দাবীর মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয়ে গোকুলের মনের মধ্যে এক প্রবল ঝড় বইয়ে দিল। ইতিপূর্ব্বে এমনতর ভাব সে নিজের মধ্যে আর কখনও অনুভব করে নাই।

মুখে কিন্তু তার তখনও কথাটি নাই, সে পূর্ব্ববৎ অচল।

এদিকে বিজয় বাবু কলেজের ছাত্রটির দিকে ফিরে বললেন "তুমি বাবু ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার একি কাজ? মূর্খ চাকরটাকে ঘুষ দিয়ে হাত করে তার দ্বারা এমন অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া কি তোমাদের উচিত? এই কি তোমাদের লেখা পড়া শেখার ফল ও এই বুদ্ধি নিয়ে কি তোমরা মানুষ হবে, দেশের কাজ করবে? তোমাদের মত ছেলের দুর্ব্বুদ্ধিই ত দেশের মাটিতে কোন উন্নতির বীজ গজাতে দেয় না। ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলের এই কাজ?" ছাত্র শ্রীশচন্দ্র এতক্ষণ বলিদানের পাঁঠার মত একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, চোখ মাটির দিকে, মুখ তুলে তাকাবার সাধ্য নাই, পা অবশ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত।

বিজয় বাবুর কথাগুলি তার কানে বিষাক্ত বাণের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে তাকে যেন একেবারে জর্জ্জরিত করে ফেলল। তার মাথা ঘুরে গেল। সে কেবল দৃঢ়স্বরে এই কথাকয়টি বলল—

"আমি মিথ্যাবাদী, চোর, কিন্তু গোকুল ঘুষখোর নয়। পুনঃ পুনঃ সে আমাদিগকে প্রশ্নপত্রগুলি বের করে দিয়েছে বটে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে একটি কানাকড়িও কখনো লয় নাই।"

সব কথাগুলিতে কর্ণপাত না করে পুনঃপুনঃ বের করে দেওয়া কথা কয়টি কানে যাওয়া মাত্র বিজয় বাবু পূর্ব্বের সম্বৃত রাগ আর চেপে রাখতে না পেরে সজোরে বলে উঠলেন—

"তুইই তাহলে বার বার কাগজগুলি বের করে দিয়ে এত বিভ্রাট ঘটিয়েছিস্? একবার নয়, দুবার নয়, বারবার—কি ভয়ানক। আর নয়, আর তোর এ বাড়ীতে থাকা নয়, বের তুই বের, আজই আমার বাড়ী থেকে মাহিনা পত্র নিয়ে দূর হ।"

বিজয় বাবু আর সেখানে না দাঁড়িয়ে একেবারে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর থেকে একজন উড়ে বেহারা এসে গোকুলকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে বাড়ীর সেই দশবছরের পুরাণ চাকর গোকুল পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে মাহিনার টাকা কয়টি কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে অপমানের একটা চাপা বেদনা বুকের মধ্যে নিয়ে, ধীরগতিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদর দরজা পার হয়ে একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

বলা বাহুল্য, সে বছরে শ্রীশচন্দ্র আর পরীক্ষা দেবার অনুমতি পায় নাই।

মাসখানেক পরে দেখা গেল গোকুল ছাত্রদের মেসে কাজ করছে! শিশুকাল হতে মাতৃপিতৃহীন, আজন্ম মাতৃস্নেহে অনভিজ্ঞ গোকুল, কে জানে কেমন ক'রে, আজ সেখানে মেসের ছাত্রদের মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের টাকা কড়ি রাখা, খাওয়া দাওয়া দেখা, সব গোকুলের ভার। তারা কলেজ থেকে ফিরছে, গোকুল জলখাবার নিয়ে হাজির। তারা রাত্রে পড়তে পড়তে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, গোকুল তাদিকে টেনে তুলে বিছানায় শোয়াবে। একটি ছেলেও জেগে থাকা পর্য্যন্ত গোকুল কখনো বিছানায় শুতো না। সমস্ত প্রাণ ঢেলে এই প্রবাসী

ছাত্রগুলিকে সে ভালবেসেছিল। এরা ছাড়া আর কাউকে বা আর কোন কিছুকে সে যেন ভাবতেই পারত না।

মেসের ঘর ক'খানি, ছাত্রদের বিছানাগুলি, তাদের টেবিলে ছড়ান বইয়ের রাশি নির্দ্দিষ্ট সময়ের খাওয়া ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের হাসি গল্প গোকুলের মনকে ভ'রে রাখতো দিনরাত। নিজের খাওয়া শোওয়ার কথা ভুলে যেতো সে প্রায়ই। ছেলেরা পরীক্ষা দেবে, টিফিন ঘণ্টায় কলা মিষ্টি ইত্যাদি জলখাবার নিয়ে সে ঠিক সময়ে সিনেটে গিয়ে হাজির। জল খাওয়ার আগেই তার মুখ দেখেই ছেলেদের মন ঠাণ্ডা হয়ে উঠতো। গোকুলের কিন্তু তখনও খাওয়া হয় নি। শুকনো মুখ, গামছা কাঁধে মেসের চাকর গোকুল দাস দাঁড়িয়ে আছে ফলের চুপড়ী মাথায় নিয়ে।

* * * *

পুরাতন ছাত্রেরা পড়া শেষ করে বাড়ী ফেরে,—মায়ের কাছে গল্প করে মেসের চাকর গোকুল তাদের কি যত্নই না করে! ছেলের বিয়ে, মা নতুন ধুতি চাদর, সোনার আংটী পাঠিয়ে দেন গোকুলের জন্যে, সন্দেশ মেঠাই তো হাঁড়িভরা আসেই। গোকুল কিছু খায়, বাকিটা বিলায় ছেলেদের।

পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে নূতন ছাত্রের আমদানী হয় বছর বছর অনেকগুলি। চলেযাওয়া পুরাতনের যায়গায় যারা নূতন আসে, প্রথম অবাক হয় তারা ছেলেদের উপর গোকুলের প্রাণঢালা মায়া মমতা দেখে, এমন আপনা-ভোলা তার সরস প্রাণের পরিচয় পেয়ে।

পুরাতনদের জিজ্ঞাসা করে "কোথায় পেলেছে এমন মেসের চাকর?"

তারা উত্তর দেয় "ভাগ্যফলে"

১লা বৈশাখ

চারটা বাজলো, গাঁয়ের উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং; ছেলের দল সার বেঁধে বেরুতে লাগল, গেটের বাইরে বেরিয়েই দিল ছুট বাড়ীমুখো হয়ে।

শুভেন্দু, মণিলাল দশবছরের ত্বটি ছেলে, এক পাড়ায় কাছাকাছি বাড়ীতে থাকে। রাস্তায় যেতে যেতে শুভেন্দু বলল—ভাই মণি, আমাদের বাড়ী আগে চল্।

মণি বল্‌ল—না ভাই, আমার মা যে ভাববে আমার দেরী হলে—আগে আমাদের বাড়ী চল্। তোকে ত্ব'মিনিটের বেশী রাখবো না, পৌছেই ছেড়ে দেব। একবারে পুরো তিন দিন ছুটি, কাল চড়ক, পরশু ১লা বৈশাখ, তরশু রবিবার। খুব মজা করা যাবে। বাবাকে ধরবো আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখতে নিয়ে যেতে; তুইও আমাদের সঙ্গে যাবি। অনেক কিছু করা যাবে এই তিনটা দিনে। বলতে বলতে রাস্তা ফুরিয়ে এল, মণিলাল শুভেন্দুকে নিয়ে বাড়ী ঢুকে খাতাপত্তরগুলো ঘরের মধ্যে তক্তার উপর আছড়ে ফেলে মাকে বলল, মা শীগগীর খাবার দাও, আমার আর শুভেন্দুর; খেয়েই আমরা শুভেন্দুদের বাড়ী যাব।

মা ব্যস্ত হয়ে ত্বই বাটিতে ভিজানো চিঁড়ে কলা দই চিনি এনে দিলেন, সঙ্গে একটা করে বড় রসগোল্লা। শুভেন্দু এসেছে, তার জন্যে মণিলালের ভাগ্যেও আজ রসগোল্লাটা জুটে গেল। মণিলাল ভাবছে, ভাগ্যে শুভেন্দুকে এনেছিলুম, বড় রসগোল্লাটা তাই জুটে গেল সহজে, নতুবা শুধু দৈ চিঁড়েই পেতুম।

খেয়েই ত্বই খোকাতে ছুট দিল শুভেন্দুর বাড়ীর দিকে। শুভেন্দুর বাবা ঘরে বসে সে সময় কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর সকাল সন্ধ্যায়

টিউশানি করা কাজ। বাকি সময় জমিজমা অনেক আছে তাই দেখা শুনা করেন। সচ্ছলে দিন চলে যায়। আয় কিছু মন্দ নয়; গ্রামে তিনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে পরিচিত, নাম রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু গিয়েই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বাবাকে বল্ল, বাবা, এক সঙ্গে তিনদিন ছুটী, এমনতরটা হয় না সচরাচর। চড়ক, ১লা বৈশাখ, রবিবার। কাল আমাদিকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখতে নিয়ে যেতে হবেই বাবা। মণিলালও আমাদের সঙ্গে যাবে। রাধাকান্ত বললেন, বেশ—কাল খাওয়াদাওয়ার পরে তুটোর সময় রওনা হব, ছোট খুকীটাকেও সঙ্গে নেব। পাঁচবছরের মেয়ে মুক্তাঝুরি একখানা গজা হাতে করে খেতে খেতে লাফাতে লাফাতে এসে পড়ল সামনে। বল্‌লেন, দাদাদের সঙ্গে কাল চিড়িয়াখানা দেখতে যাবি? মেয়ে বলল—চিড়িয়াখানা কি? কি আছে সেখানে? শুভেন্দু বলল—জানিসনে বুঝি? বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, হাতী কতকি—দেখবি তখন।

নামগুলো শুনে মুক্তা হাঁ করে দাদার মুখের দিকে ফেলফেলিয়ে চেয়ে রইল; এমন সব জন্তুর নাম সে কোনদিন শোনে নাই।

ঘরের টাটকা তৈরী গজা রেখেছিলেন শুভেন্দুর মা—চার চারখানা করে তুই ছেলেতে পেল; বিকেলটা কাটলো তাদের খুব খুসীতে, কাল যাবে চিড়িয়াখানা।

২

সকালে উঠে শুভেন্দু গিয়ে হাজির মণিলালের বাড়ী। মণিলাল সেই সবে উঠে মাকে বলছে, আজ শীগ্‌গীর আমার ভাত চাই—চিড়িয়াখানা যেতে হবে। ও বাড়ীর কাকাবাবু—শুভেন্দুর বাবা—আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন। মা বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, সেত

সেই দু'টোর সময়, এখন থেকে তার জন্য ব্যস্ত কিসের ? ভাতের দেরী হবার ভয় নেই তোর।

—আচ্ছা, আমরা চললুম এখন পুকুরধারে। কাঁচা আম গাছে ঝুলছে অনেক ; গোটাকতক পেড়ে আনবো আর গামছা দিয়ে পুঁটি মাছ ধরবো,—টক রেঁধো। মা বললেন—আম পাড়া, মাছ ধরা, জলে নামা,—সাবধান, জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিসনি যেন। তোর বাবা এখন বাড়ী নেই, এসে আমাকে না বকেন।

মণিলাল বললো, কিছু ভয় নেই, এখনি ফিরে এলাম বলে, মাছ নিয়ে—আম নিয়ে।

চললো দুজনে পুকুরধারে। কাঁচা আম পেড়ে খাবার জন্য সঙ্গে খানিকটা নুন নিতে ভুলল না। পুকুরপাড় তখন জনশূন্য—ইচ্ছামত গাছে চড়ে আম পাড়ল দু'জনে কোঁচড় ভ'রে। পুকুর ঘাটে নেমে গামছা দিয়ে ছাঁকাজাল তৈরী করে চুনো মাছ ধরতে লেগে গেলো দু'জনে। দু'টো চারটে মাছ পড়ে আর আহ্লাদে অধীর হয়ে তারা চীৎকার করে ওঠে—"দেখ্ দেখ্ চুনো পুঁটি মৌরলা কুচোচিংড়ী কত কি পড়েছে! কি মজা ? ঘাটের এক পাশে শেওলাচাপা মাছের গাঁদি দেখা গেল। দু'জনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই গাঁদির উপর—আগে কে মাছগুলো হাতাতে পারে। ঠেলাঠেলির চোটে মণিলাল ধাক্কা দিয়েছে শুভেন্দুকে পিছু হঠাবার জন্যে। ফলে নিজের ঝোঁক সামলাতে না পেরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল অনেক জলে। হাবুডুবু খাচ্ছে—সাঁতার জানা নেই—ডোবে আর কি! শুভেন্দু ভয়ে মাছ, আম, ডাঙায় ফেলে চীৎকার জুড়েছে—ও বাবা, কে আছ দৌড়ে এসো, মণিলাল ডুবে গেল,—

পুকুর পাড়ের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল এক বাগ্দীবুড়ী হাতে নতুন তৈরী

বাঁশের কয়েকটা ঝুড়ি চুপড়ী নিয়ে,—বেচতে চলেছে হাটে। চেঁচানি শুনে বলল—কি হয়েছে রে? অমনি চোখে পড়ে গেল তার মণিলালের জলে-ডোবা মূর্ত্তি, মাথার চুলগুলি দেখা যাচ্ছে, বাকি সব অদৃশ্য। চুপড়ী ফেলে বাগ্দীবুড়ী দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিল জলে, সাঁতরে গিয়ে জাপটে ধরল মণিলালের দেহখানা, টেনে তুললো কিনারায়। বাগ্দীবুড়ীর গায়ে অসুরের বল। সেকেলে মজবুত হাড়ে জোর কত! বুড়ী মণিলালকে ঝাঁকানি দিয়ে পেটের জলটা দিল বের করে—ডুবে জল খেয়েছিল মণিলাল অনেকখানি। চোখমেলে রয়েছে মণিলাল জ্ঞান যায়নি একটুও—সেই সবে মাত্র ডুবছিল। ফুঁ দিয়ে মন্তর পড়ে বাগ্দীবুড়ী বলল—যা বেটা যা, ঘরে যা, বাপমায়ের ছেলে বাপমায়ের কাছে ফিরে যা।

বাগ্দীবুড়ী অনেক বিষয়ে ওস্তাদ—ওষুধ বড়ি মন্তর তন্তর জানে অনেক। শুভেন্দু বলল—বাগ্দীবুড়ী, আমাদের বাড়ী চল—বকশিশ নিবি বাবার কাছে। বাগ্দীবুড়ী বলল—যা যা বকশিশ তোরা নিগে যা, মেয়েটার অসুখ, তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

যে কটা চুনো মাছ গামছায় জড়ান ছিল সবগুলোই ঢেলে দিল শুভেন্দু বুড়ীর চুপড়ীতে, সঙ্গে দিল গোটাকতক কাঁচা আম। বুড়ী খুসী মনে গেল চলে।

মণিলালকে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে শুভেন্দু চোরের মত ভয়ে ভয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল, আগে ঢুকল মণিলালের বাড়ী। গিয়েই মণিলাল শুয়ে পড়ল বিছানার উপর। মা বেরিয়ে বললেন, ব্যাপার কি? শুভেন্দু কাঁদ কাঁদ হয়ে কাঁপা গলায় বলল, মণিলাল একটুখানি জলে গিয়েছিল পড়ে—বাগ্দী বুড়ী তুলে দিলে তাই রক্ষে।

মা বলল, ডুবেছিল বুঝি! যা ভয় করেছি তাই; আচ্ছা দস্যি ছেলে

তোরা বাপু। বলেই ছুটে তিনি গেলেন মণিলালের কাছে। তাকে সুস্থ দেখে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। তাড়াতাড়ি একবাটি গরম দুধ এনে তাকে খাওয়ালেন। একটু পরেই মণিলাল উঠে বসে বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে লাগল।

মণিলালের বাবা বাড়ী এসে শুনলেন সব কাণ্ড; সেদিনকার মতন চিড়িয়াখানা যাওয়া গেল ঘুরে। রাগ করলেন ছেলেদের উপর—গৃহিণীর উপর। একটু পরেই রাগ ভুলে বাগ্দীবুড়ীর উপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল খুব বেশী। বিকেলে গেলেন বাজার, বাগ্দীবুড়ীর জন্যে ও তার খুকীর জন্যে নতুন শাড়ী কিনলেন দু'খানা। কয়েকটা কমলা, একটা ডালিম, কিছু মিশ্রীও নিলেন কিনে, বাগ্দীবুড়ীর খুকীর জ্বর—তাকে দেবেন বলে।

৩

পরদিন ১লা বৈশাখ মণিলালের বাবা মণিলাল ও শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লেন বাগ্দীবুড়ীর কুঁড়ের দিকে। উঠানে দাঁড়িয়ে বাগ্দীবুড়ী একটা বকনা বাছুরকে তখন খেতে দিচ্ছিল বাসি ভাত ফ্যান যা ছিল তার মাটির গামলায় ঢালা। মণিলালের বাবা বললেন—বাগ্দীবুড়ী, আমার ছেলেকে কাল বাঁচিয়েছ, তার বদলে কী তোমাকে দিতে পারি জানি না, যৎসামান্য কিছু এনেছি, নিলে সুখী হব।

বাগ্দীবুড়ী বলল—ছেলেটা ডুবে মরে—তুলে আনব' না ত কি! তার জন্য আবার দেবার কি আছে? ছেলেগুলো আমাকে মাছ দিয়েছে, আম দিয়েছে সেই ঢের। মণিলালের বাবা বললেন, তা হবে না বাগ্দীবুড়ী, আজ থেকে তোমাকে আমরা বাগ্দীমাসী বলে ডাকব,

দু'খানা নতুন কাপড় এনেছি, তুমি ও তোমার খুকী পরবে আজ ১লা বৈশাখে। একটু ফল মিশ্রী এনেছি, খুকীর জ্বর, তাকে দাও খেতে। শুনেছি তুমি নাকি খুব ভাল বাঁশের কুলো, ডালা, চুবড়ী, ঝুড়ি বুনতে পার। আমাদের মেয়ে স্কুলটাতে তোমাকে হপ্তায় দু'দিন গিয়ে শেখাতে হবে—তার জন্য মাসে মাহিনা পাবে দুটাকা—খুকীটাকেও সেই স্কুলে ভর্ত্তি করে দিও; যা পারে শিখবে কিছু লেখাপড়া। বাগ্দীবুড়ী বলল—ভদ্রলোকের মেয়ে আবার বাঁশের চুপ্‌ড়ী বুনবে, ওমা—কী ঘেন্নার কথা! মণির বাবা বললেন—হাঁ, তারা বুনবে; ঐ সব কাজ হাতে কলমে করলে কাজগুলোর ওপর তাদের দরদ জন্মাবে—তার দরকার আছে।

কথা শেষ করে দু'টি টাকা গুঁজে দিলেন বুড়ীর হাতে মণির বাবা। গোটা টাকা হাতে পায়নি বুড়ী কখনো, এত বয়স হোল। চোখদুটো উপর বাগে তুলে বলল, আজ আমার কপাল বড় জোর, বছরের পইলে দিনে এত সুখের খবর! মাথা নেড়ে বলল—ও বছরে এমনতরটা শুণেছিলাম বটে।

বাগ্দীবুড়ী শুণতেও জানে।

নিশানাথ

অপরাজিতার বয়স যখন সবে সাত বছর তখনই তার পা দুটি পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়। এখন সে বাইশ বছরের। এই পনের বৎসরকাল বাপের বুকটিতে সে দুঃখের হার হয়ে ঝুলে রয়েছে। তাকে ছেড়ে বাপ কোন কাজে হাত দিতে পারেন না। মা নেই, বাপ ছাড়া মেয়েকে দেখবে কে?

বাপ নিশানাথ মজুমদার অল্প বয়সে বিবাহ করে' অল্প বয়সেই

সংসার-সুখে বঞ্চিত হন। নিতান্ত শৈশবে নিশানাথের পিতৃবিয়োগ হয়। বিধবার একমাত্র সন্তান শান্ত সুশীল ও সচ্চরিত্র ছেলে নিশানাথ মায়ের আজ্ঞায় একুশ বছরে পড়তেই বিবাহ করেন। ছোট থেকে ছেলের উদাসীন ভাব লক্ষ্য করে' মা হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছেলের বিবাহ দিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলক্ষণা সুন্দরী মণিপ্রভাকে দেখে পছন্দ করে' ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন।

মণিপ্রভার যেমন রূপ তেমনি গুণ। তাকে পেয়ে নিশানাথ খুব সুখী। ছেলেকে সুখী দেখে বড় প্রীত হয়েই হৈমবতী স্বর্গে চলে গেছেন, অপরাজিতা সবে তখন তিন মাসের।

বাপের অগাধ জমিদারী, সাধ্বী স্ত্রী মণিপ্রভা পাশে, শিশুর হাসিতে ঘর আলো, তবু মায়ের মৃত্যুতে নিশানাথকে আবার উদাস করে ফেলল। মৃত্যুর ফাঁকে তাঁর গোড়ার স্বভাবটি আবার ফুটে উঠল। নিতান্ত স্বল্প ব্যয়ে, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরে নিশানাথ মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন। নায়েব, গোমস্তা, প্রজাবর্গ ও আশপাশের গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—"ব্যাপার কি হে? পাঁচ লক্ষ টাকার জমিদারী, বাবু মায়ের শ্রাদ্ধে একটা পয়সাও দান করলেন না। ব্রাহ্মণভোজন, কাঙালীবিদায় কিছুই হল না। সন্দেশ মেঠাইয়ের একটি টুকরোও কেউ চোখে দেখতে পেলো না। এতো বাপু ঔদাসীন্য নয়, এ অদ্ভুত কার্পণ্য। ছোট নজর মশায়, ছোট নজর।"

নিশানাথের স্বভাবে মন্দ বলার কিছু ছিল না। সুখ্যাতি বল আর অখ্যাতি বল, ভাল বল আর মন্দ বল, বলার যদি কিছু থাকে ত' সে ঐ এক গোড়াঘেঁসা ঔদাসীন্য।

শ্রাদ্ধের ব্যাপারে সকলে যখন এইভাবে তাঁর ঔদাসীন্যের দোষ

দিতে ব্যস্ত হঠাৎ তখন সকলের কাণে গেল একলক্ষ টাকার আয়শুদ্ধ জমিদারীর একটি অংশ নিশানাথ বাবু মায়ের নামে দান করেছেন অনাথ মেয়েদের লেখা পড়া ও শিল্প শিক্ষার দ্বারা তাদিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্ত। যেমন কথা তেমনি কাজ সুরু সঙ্গে সঙ্গে।

লোকে দেখলে, অনেকগুলি মেয়ে নিয়ে নিশানাথের গ্রামের মধ্যে "হৈমবতী শিক্ষালয়" খাড়া হয়েছে। জিনিষটি চোখে দেখে প্রাণের ভিতর থেকে সবাই ধন্ত ধন্ত বলতে লাগল। একজন বলল—"সত্যকার বৈরাগ্য হে, সত্যকার বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্যের ভিতর জিনিষ আছে, সাধনা আছে, ফাঁকা আওয়াজ নয়।" অন্তজন বলল—"তা আর হবে না? কেমন বাপের ছেলে? বাপ ছিলেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ।"

মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করে, দেশের বুকে মায়ের নামটি চিরস্মরণীয় করে রেখে, ডাক্তারের পরামর্শে অবশাঙ্গ অপরাজিতাকে নিয়ে তিনি পুরী যাত্রা করলেন—সমুদ্রজলে স্নান ও নোনা হাওয়ায় অসাড় স্নায়ুগুলিতে যদি সাড়া জাগে, এই আশায়। সঙ্গে গেল একজন শিক্ষিতা নার্স মেয়ের যাতে সেবা যত্নের কোনদিক থেকে ত্রুটি না হয়। নড়াচড়ার শক্তি রহিত অপরাজিতা ঘরের কোণে বন্ধ থেকে মনমরা হয়ে গিয়েছিল এত বেশী যে, কোন উপায়ে তার প্রাণে যে নূতন আনন্দ জাগবে এ ভরসা তার নিজেরও ছিল না, বাপেরও না।

সাগর-কিনারায় মুক্ত বাতাসের মধ্যে অপরাজিতার মনটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল। সামনে আকাশ-ছোঁয়া জলরাশীর সীমাহীন রূপ তার মনকে বিছিয়ে দিল আকাশ ও সাগরের মাঝখানে। নার্সকে ডেকে অপরাজিতা বলল—"মাসিমা, এখানে থাকলে আমি নিশ্চয় সেরে উঠবো মনে হচ্ছে।" অপরাজিতার ডাক নাম অরু। নার্স বল্ল—"হাঁ অরু, তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে। ঠেলাগাড়ী করে আমি তোমাকে

রোজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে নিয়ে যাব; বাবা ঠেলাগাড়ী কিনে দেবেন, বলেছেন।" অরুর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সমুদ্রের দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বাড়ীখানা সমুদ্রতীরেই।

২

মেয়েটিকে সুস্থ দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিশানাথ পুরীর নানা স্থানে সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে ঘুরে বেড়ান সকল সময়। ভগবৎপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বকথা তাঁর মনকে আকর্ষণ করে অনেকখানি। সময় সময় বাড়ী ফিরতে তাঁর বেশ রাত্রি হয়ে যায়। একদিন বাড়ী ফিরে নার্সকে ডেকে নিশানাথ বল্লেন, "অরু অনেকটা সুস্থ হয়েছে, না?" সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল—"পা'টা কিন্তু ওর জীবনে সারবে কিনা সন্দেহ। একজন সাধু আমাকে বলেছেন, অরুকে একবার দেখবেন, তিনি নাকি পক্ষাঘাতের ওষুধ জানেন। বিশ্বাস হয় না, তবু আনবো একদিন।" বলে তিনি শুতে গেলেন।

একদিন সকালে নিশানাথ সেই সাধুকে সঙ্গে করে' অপরাজিতাকে দেখাতে আনলেন। সাধুর পরণে গেরুয়া, তাছাড়া সন্ন্যাসের আর কোন চিহ্ন তাঁর অঙ্গে নাই। নিশানাথ অপরাজিতাকে দেখালেন। অনেকক্ষণ অরুর পাদু'টি নাড়াচাড়া করে সাধু বল্লেন, বয়স কম, সারতেও পারে; ওষুদ আছে। বলে তিনি নার্সকে ডেকে এক নতুন ধরণের দলামলা (ম্যাসেজ) দেখাতে লাগলেন—বল্লেন, "শিখে নাও। আর গোটাকতক জায়ফল সর্ষের তেলে ফুটিয়ে সেই তেলটা দুবেলা মালিশ করো। অন্য ওষুদ আমি কাল বৈকালে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।"

পরদিন কৌটায় করে কতকগুলি বড়ি এনে সাধু নার্সের হাতে দিলেন

ও নিয়মিত ভাবে খাওয়াতে বললেন। ছয়মাসে অপরাজিতার পা অনেকখানি সচল হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় আজন্ম পঙ্গু অরুর পা কখনো যে চলক্ষম হবে, স্বপ্নের অগোচর। এখন অরু নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে অল্প অল্প পা ফেলে সমুদ্রতীরে হেঁটে হেঁটে যায়। নিশানাথের বুকের বোঝা যেন নেমে গেছে অরুকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে ও পা ফেলে এগুতে দেখে। অরুর আরোগ্যলাভ নিশানাথকে হাল্কা করে দিল সংসারের দায় থেকে অনেকখানি।

মাসখানেকের মধ্যে একটা নূতন ব্যবস্থার আয়োজন দেখা গেল। কলকাতা থেকে একজন বড়দরের লেডী ডাক্তার এসে উপস্থিত হল অরুদের পুরীর বাসাবাড়ীখানিতে। শোনা গেল, বাড়ীখানি নিশানাথবাবু কিনেছেন ও রেজেষ্ট্রি করে দান করেছেন মহিলা রোগী-নিবাস হবার জন্য। ভার দিয়েছেন স্থানীয় ভদ্রলোকদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির হাতে, নিশানাথের তরফ হয়ে তাঁরা দেখাশোনা করবেন ও টাকার দায়ীত্ব রাখবেন। লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়েছে নিবাসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে। নিবাসের নাম দিয়েছেন "মণিপ্রভা রোগী-নিবাস"। ব্যবস্থা সব ঠিক, কাজ সুরু হবে ১লা বৈশাখ থেকে।

অপরাজিতাকে না বলে নিশানাথ সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে হিমালয় যাত্রা কল্লেন—কেদারনাথ দর্শনে। রাস্তা থেকে অপরাজিতার নামে চিঠি পাঠালেন "মা, আমি আবার ফিরবো।"

জ্যৈষ্ঠ-জাগানো

জ্যৈষ্ঠের দুপুর—আগুনভরা বাতাস চলছে হু-হু-হু-হু। পশ্চিমে এ সময় পথে বের হয় সাধ্য কার! লু লেগে গা যেন পুড়ে' ছাই হ'য়ে

যায় প্রতিক্ষণে ; সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপ বেড়ে ওঠে কয়েক ডিগ্রি। এ-হেন দারুণ গ্রীষ্মেও বাংলার পল্লী কিন্তু ছায়াশীতল থাকে অনেকখানি। বড় বড় গাছের তলা দিয়ে তার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে সারা দুপুর, ঝির্ ঝির্ ঝুর্ ঝুর্।

সাবেকী আমলের জমিদার-গৃহিণীদের পুণ্যছলে প্রতিষ্ঠাকরা প্রকাণ্ড অশথ্ গাছগুলি ডাল-পালা ছড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পল্লীর বুক ঢেকে প্রায় আধ ক্রোশ অন্তর অন্তর এক একটি। মাঝে মাঝে বিপুলদেহ বটও স্থান জুড়েছে কম নয়। সিঁদুরমাখানো একটা অশথ গাছের গুঁড়ির গোড়ায় পল্লীর মেয়েরা সাঁজ সকালে ঘাটে জল আনতে গিয়ে চলার পথে খানিকটা করে' জল ঢেলে দিয়ে যায় প্রতিদিন। একাদশী প্রভৃতি পুণ্যতিথিতে সিঁদুর লেপে আসে গুঁড়ির গায়ে।

কত সন্ন্যাসী, পথিক দুপুরে বিশ্রাম পায় সেই গাছের তলায়। পিঠ ঠেস দিয়ে, কেউ চোখ বুজে একটু ঘুমিয়ে থাকে, কেউ বা গুনগুনিয়ে গান ধরে। সন্ন্যাসীদের নিজের মনে শ্লোক আওড়াতেও দেখা যায়।

রাখাল ছেলেরা মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে আম-জামের গাছে চড়ে' বাড়ি দিয়ে গাছের তলা আমে জামে বিছিয়ে দেয়। তাদের আম-জাম খাওয়ার ধূম দেখে কে! এই করে' গ্রীষ্মের দুপুরের খরা রোদকে তারা ফাঁকি দেয় ষোল আনা। পল্লীর আম-কাঁঠাল-জাম-জামরুল-ফল্সা, কচি তালের শাঁস—রস যোগায় কম নয় গ্রীষ্মের দুপুরে। বাংলার সৌন্দর্য্যভরা এই গ্রীষ্মের দুপুরটি উপভোগ্য কতখানি—পল্লবাসীরাই জানে।

পল্লীর বুকে জামাই-ষষ্ঠীর ঘটা রসালো ফলের মতই উপাদেয়। ঘরে ঘরে জামাই আসার ধুম পড়ে' যায় ঐ দিনে। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে আদর-আয়োজনের ব্যবস্থা। সহরে থালা সাজিয়ে তত্ব পাঠিয়ে, রাতের নিমন্ত্রণে চপ কাটলেট খাইয়ে,—কখনো খাওয়ার পর খরচ করে'

জামাইবাবুকে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়ে সহরের শাশুড়ীরা কাজ সারেন সবটুকু।

গ্রামে তেমনতরটি হওয়ার যো নাই। গ্রামের গৃহিণীরা পাঁচ-সাত দিন আগে থেকে ষষ্ঠী-বাঁটার আয়োজন করতে থাকেন বিধিমতে।

শান্তিপুরের শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে এ বছর জামাইষষ্ঠীর বড় ধুম। ছয় ছেলেতে একটি মেয়ে শশিবাবুর ঘরে। আদর করে' বাপ মেয়ের নাম রেখেছেন পূর্ণতরা—ডাক নাম পূর্ণা। বর খুঁজে' মনে না ধরায় পূর্ণার বিয়ের বয়স প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতা ছোট আদালতের উকিল রমাপ্রসাদের সুশ্রী চেহারা দেখে, সুনাম শুনে ও বেশ অবস্থাপন্ন বুঝে যোল বছরের কন্যা পূর্ণাকে শুভক্ষণে সবে গত অঘ্রাণে শশিবাবু সম্প্রদান করেছেন।

আজ জামাইষষ্ঠী। বড় সাধ্যসাধনায় শশিবাবুর সাধের জামাই আজ এসেছেন শ্বশুরবাড়ী। বেয়াই বেয়ানের অনুমতি নেওয়া বড় ছেলেকে পাঠিয়ে, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধপত্র কলকাতায় জামাইবাবুর কাছে লিখে শ্বশুর আজ জামাই এনেছেন। পূর্ণার কাছ থেকেও গোপন-পত্র গিয়ে থাকবে, কে জানে তাতে কাজ এগিয়েছে কতখানি! ঘরে-বাইরে পরিবারে আজ আনন্দের ঢেউ তুলছে সকলখানে। বাড়ীর পুরানো ঝি হারামণি জামাই বাবুকে পথ দেখিয়ে ঘরে আনছে কি উল্লাসে! ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা, পূর্ণার ছ'ভাই ছয়দিক আলো করে' বসল জামাইবাবুকে ঘিরে'। গল্প চলল খানিকক্ষণ। শেষে জল খাওয়ানোর পালা! বড় বড় পাথরের রেকাবীগুলিতে ফলকরা সাজানো হরেক রকম। একটা রেকাবীতে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলী, বাদাম-তক্তি, নারকোলের চিঁড়ে, ঘরের তৈরী সরের নাড়ু, ক'লকাতা থেকে আনা পেস্তার সন্দেশ, বাগবাজারের বড় রসগোল্লা থরে থরে সাজানো।

বড় ঘরের মেঝেতে পুরু গালচে-আসন পেতে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা। শাশুড়ী বসে' আগলাচ্ছেন খাবারগুলি; জামাই এসে বসলেই পাশের ঘর থেকে ধুতি চাদর পাঞ্জাবী রুমাল সেণ্টের শিশি দিয়ে সাজানো থালাখানি এনে ধরে' দেবেন জামাইবাবুর সামনে।

পূর্ণতিরার হৃদয়খানি আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে কানায় কানায়। নতুন ফ্যাসানের লাল রংএর ফর্ম্মাসী ডুরে মা আনিয়েছেন কলকাতা থেকে, পূর্ণা আজ পরবে। সঙ্গে লেসের ব্লাউস্, বাদামী রংএর ফিতে দিয়ে নকসা-করা সুন্দর একটি বুকে-পিঠে ছক্-কাটা সেমিজ। কাপড়গুলি গুছিয়ে রেখে চুল বেঁধে পূর্ণা গেল দারোগাবাবুর বউকে ডাকতে, ঘাটে ছ'জনে গা' ধুতে যাবে।

দারোগাবাবুর বৌ কমলমুখীর সঙ্গে ছোট থেকে পূর্ণার বড় ভাব। কমলমুখীর বিয়ে হয় বালিকা বয়সে। এগার বছরের বাপ-মা-মরা মেয়ে শ্বশুর-ঘর করছে সেই থেকে। এই গাঁয়ে দারোগাবাবু চাকরী নিয়ে এসেছেন আজ আট নয় বছর হ'ল। সঙ্গে বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। কমলমুখীকে বিয়ে করেছেন তিনি এ গাঁয়ে আসার মাস ছয় আগে।

কমলমুখী মেয়েটি যেন দীপ্তিময়ী। প্রখর বুদ্ধিতে তার মুখখানি সদাই যেন জ্বলতে থাকে। দারোগাবাবু তাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন স্বয়ং যতটা সম্ভব। ঘরের কাজও করে কমলমুখী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যা দরকার হয়। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট, কাপড় কাচা, বিছানা করা, সন্ধ্যায় হ্যারিকেন জ্বালানো, তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। একটা চাকর আছে সে হাটবাজার করে, কুয়ো থেকে জল তোলে, গরুকে খাওয়ায়, সকালে দুধ দো'য়, লোক এলে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া তার কাজ। রান্না করেন দারোগাবাবুর মা, সে ভার বৌএর উপর কখনো

দেন না ; তিনি সন্তানবৎসলা জননী, পিতৃমাতৃহীনা বৌটিকে স্নেহ করেন মেয়ের মত। সুখের সংসার, অভাব নাই এতটুকু।

তলে তলে গোপনে দারোগাবাবু বৌকে কুস্তির প্যাঁচ্ শিখিয়েছেন দু'চার রকম, শাশুড়ীর চোখে পড়েনি কিন্তু কোন দিন। রাত্রে অনেক সময় মা ঘুমুলে দারোগাবাবু বৌকে নিয়ে বেড়িয়ে আসেন অনেক দূর। পুলিশের কায়দাকানুন ধরণধারণ অনেক বুঝে নিয়েছিল কমলমুখী এই বয়সে। থানার কুচকাওয়াজও চোখে পড়ত তার পথচলার সময় প্রায় প্রতিদিন। এই সব আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে কমলমুখীর চিত্ত বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বিলক্ষণ। একেই ত' সে প্রখর বুদ্ধিশালিনী।

কমলমুখীকে আজ ডাকতে এসেছে পূর্ণা তার আনন্দ-উদ্বেলিত চিত্ত নিয়ে বাড়ীর কাছের বড়-পুকুরে গিয়ে গা ধুতে। বাঁধান ঘাট, মেয়েরা সাঁজ-সকালে নাইতে, গা ধুতে এসে আশ-পাশের ঘন ঝোপের আড়ালে শুকনো কাপড় রেখে জলে নেমে পড়ে। খানিকটা সাঁতার কেটে' সিঁড়ির ধাপে বসে' তারা ঘসে' ঘসে' সাবান মাখে কতক্ষণ।

পূর্ণা ও কমলমুখী দু'জনে এইভাবে আজ জলে পড়ে' যখন সাঁতার কাটছে তখন দুটো দুষমন চেহারার লোক সাঁ করে' যেন সরে' গেল ঝোপের পাশ দিয়ে। কমলমুখী বড় হুঁসিয়ার। তার চোখ এড়ায়নি দুষমন দুটোর ঐ লুকোন ধরণে সরে' যাওয়া।

পূর্ণার ফুলের মত সুন্দর মুখখানি তখন ভাসছে জলের বুকে, শরীরটা জলে ডোবা। মনের সুখে জলের বুকে ভেসে চলেছে সে এপার থেকে ওপার। কমলমুখীর কাছ থেকে সে তখন খানিকটা দূরে।

অল্প জলে পা ডুবিয়ে পৈঠায় বসে' পূর্ণা যখন সাবান ঘসছে দু'হাত দিয়ে জোরে জোরে গায়ে পায়ে, তখন ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ

লাফিয়ে পড়ে' ছুটো লোক তার চোখে মুখে কাপড় বাঁধতে লাগলো ক্ষিপ্র হাতে।

পলক্ ফেলতে দেখে নিল কমলমুখী ব্যাপারখানা, কর্ত্তব্য স্থির করে নিল মুহূর্ত্ত মধ্যে; দারোগাবাবুর কাছে তার শেখা আছে বিপদে পড়লে কর্ত্তে হবে কি। উপস্থিত বুদ্ধি জুগিয়ে গেল তার এক নিমেষে, ডুব-সাঁতারে পৌছে গেল পূর্ণতরার পায়ের গোড়ায়। সামনে-এগোন ছুষমনটার পায়ে গামছার একটা প্যাঁচ জড়িয়ে সজোরে দিল সে টান, সঙ্গে সঙ্গে ফিতে-বাঁধা গলায় ঝোলান পুলিসের হুইসিল ছিল কাছে, সজোরে তাতে দিল ফুঁ। পুকুরের জল, গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাপ কাঁপিয়ে বেজে উঠলো সেই সঙ্কেতধ্বনি জায়গাটা জুড়ে।

আওয়াজ পেয়ে পুলিশ এসে পড়ার ফাঁকে ছুষমনটা পূর্ণাকে ছেড়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো কমলমুখীকে, অন্যটা পূর্ণতরার দেহখানা কাঁধে ফেলে দিল ছুট। ইত্যবসরে পুলিশ এসে হাজির, দৌড়ে গিয়ে ঘিরে ফেললো ছুষমন ছ'টোকে ছুদিক থেকে। কমলমুখীর কাছে তখন উপস্থিত হ'য়েছেন দারোগাবাবু স্বয়ং, পিছন থেকে আক্রমণকারী ছুষমনটার গলা চেপে ধরেছেন সজোরে। ছুটো পুলিশ ধাক্কা মেরে ফেললো তাকে মাটিতে, চড়ে বসলো তার বুকের উপর।

পুলিশ-ঘেরা পথে পূর্ণার দেহখানা আছড়ে ফেলে অন্যটা উর্দ্ধশ্বাসে দিল দৌড়, পুলিশ ছুটলো পিছু পিছু—সবার চোখে ধূলো দিয়ে সরে' পড়লো সে কে জানে কোন দিকে।

এদিকে সন্ধ্যা ঘিরে এল দেখে মা ব্যস্ত হচ্ছেন; ছোট খোকাকে বললেন—দেখে আয়ত রে, তোর দিদি এখনো ঘাট থেকে কেন এল না? কথাটা একটু আস্তে বললেন, সবটা জামাইয়ের কানে না পৌছায়। নিমিষের মধ্যে খোকা দৌড়ল পুকুরঘাটের দিকে। দূর থেকে

লালপাগড়ীর সার দেখে ভয়ে সে চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগল—মা, মা, দিদিকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

জামাইবাবু জল খেয়ে উঠে সবে হাত ধুচ্ছে। ছোট খোকা রাজুর কথায় বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণার ভাইরা ও রমাপ্রসাদ দ্রুত পা চালিয়ে খোকার আওয়াজ অনুসরণ করে চললো। বাপ-মা তখনো সঠিক খবর জানতে পারেন নি। ঘাটে পৌছে দেখলো তারা, ভিজে কাপড়ে কমলমুখী ঘাসের উপরে বসে পূর্ণার মাথাটা কোলে নিয়ে। পূর্ণা সবে তখন চোখ মেলেছে। চারিদিকে পুলিশ, একপাশে দড়ি-বাঁধা দুর্যমন, সামনে স্বয়ং দারোগাবাবু।

পূর্ণার বড় ভাই ধীরে ধীরে পূর্ণাকে তুলে দাঁড় করাল ও বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল,—সঙ্গে রমাপ্রসাদ। ইতিমধ্যে বাপ-মায়ের কানে খবর পৌছেছে সবটুকু। পূর্ণাকে ভাল দেখে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শশিশেখরবাবু জামাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—বাবাজি, কথাটা যেন বাড়ীতে না যায়। বেয়াই মশায় বেয়ান ঠাকরুণ কি বুঝতে কি বুঝে বসবেন।

রমাপ্রসাদ বললে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।